বিল্লেসুর বকরিহা

আদান প্রদান

বিল্লেসুর বকরিহা

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা'

অনুবাদ

কমলেশ সেন

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

ISBN 81-237-1950-7

1996 (শক 1918)

মূল্য : 19.00 টাকা

Billesur Bakriha *(Bangla)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লী-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

ভূমিকা

নিরালা (1899-1961) 'ছায়াবাদের' একজন বড় মাপের কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি 'ছায়াবাদকে' অতিক্রম করে বাস্তববাদের নতুন রূপকেও বিকশিত করেন। যে রূপের উদ্ভাস 'কুকুরমুত্তা' এবং 'নয়ে পত্তে-র' কবিতাগুলিতে এবং 'চতুরী-চামার', 'কুল্লীভাট' এবং 'বিল্লেসুর বকরিহা'-র মতো কথাসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। নিরালার রচনাকাল বিংশ শতাব্দীর যে চার দশক জুড়ে পরিব্যাপ্ত, তা জাতীয় আন্দোলনের কঠিন এবং তিক্ত অনুভবগুলির সঙ্গেই সম্পৃক্ত। নিরালার স্বাধীন চেতনার গহীন ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমস্ত রচনাসম্ভারে পরিলক্ষিত হয়। 'পরিমল'-এর (1929) ভূমিকায় নিরালা কবিতার মুক্তির প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। 'কুল্লীভাট' এবং 'বিল্লেসুর বকরিহা'-র মতো উপন্যাস এক অর্থে উপন্যাসের মুক্তির প্রশ্ন তুলে ধরে। প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে ভিন্ন ধরনের নতুন কথাসাহিত্যের অনুসন্ধানে এ-উপন্যাস দুটি সার্থক দৃষ্টান্ত। হাস্যব্যঙ্গ এবং বাস্তবতার মর্ম-যন্ত্রণায় সমৃদ্ধ এক বিশেষ উদাহরণও বটে।

এক বিশুদ্ধ ভারতীয় উপন্যাস হিসেবে 'বিল্লেসুর বকরিহা' নিরালার এক অদ্ভুত গদ্যকৃতি। এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিরালা একে 'হাসির একটি স্কেচ' বলেছেন। তাই অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই, এ-জন্যেই 'বিল্লেসুর বকরিহা'-কে দীর্ঘকাল ধরে 'রেখাচিত্র' বা 'রেখাচিত্রধর্মী' উপন্যাস বলা হয়েছে। বস্তুত, চল্লিশ দশকের শেষ এবং পঞ্চাশ দশকের শুরুতে উপন্যাসের রূপ কাঠামোর মুক্তির নতুন আভাস দেয় এই উপন্যাস। দেশজ হাস্যবিনোদ এবং সৃজনধর্মীতায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাসে কথানায়ক বিল্লেসুরের জীবনসংগ্রামের ট্র্যাজেডির মর্মব্যথা লুকানো রয়েছে। উপন্যাসের সমাপ্তি যদিও লোককথার রূপ, রঙ এবং আমেজে সুখপ্রদ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এই উপন্যাসের সমগ্র আবেদনে রয়েছে কথানায়কের তিক্ত এবং কঠিন জীবন-সংগ্রামের এক মর্মন্তুদ আখ্যানও।

1942 সালে 'বিল্লেসুর বকরিহা' প্রকাশিত হয়। সেই বছরেই নিরালার দীর্ঘ কবিতা 'কুকুরমুত্তা' প্রকাশিত হয়। যে কবিতায় কবিতার আভিজাত্যের বিরুদ্ধেও সার্থক বিস্ফোরণের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। 'বিল্লেসুর বকরিহা'র দুটি অংশ 1939 সালে এ 'রূপাভ'-তে প্রকাশিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ

1945 সালে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের ভূমিকায় এই উপন্যাসকে নিরালা 'প্রগতিশীল সাহিত্যের নমুনা' বলেন। এই উপন্যাসের শিল্প কাঠামোর নতুনত্ব সম্পর্কে নিরালা বলেন, 'বহিরঙ্গ চিত্রণের পরেই অঙ্গ-চিত্রণ সূচিত হয়, যা প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রথম ধাপ।' যেন তিনটি ছোট-বড় গল্পের প্লটকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে এর শিল্পরূপকে সৃষ্টি করা হয়েছে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি, সমাপ্ত হয়েও অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। যা পাঠককে ধাক্কা দেয়। কিন্তু মনে শক্তি জোগায়। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, নিরালা শুধু উপন্যাসের অন্তর্বস্তু নিয়েই নয়, তার রূপ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। 'বিল্লেসুর বকরিহা'কে তিনি 'হাসির স্কেচ' বললেও, এই উপন্যাসের রূপ কাঠামোকে তিনি অবহেলা করেননি। বর্ণনা-শৈলী, কথা বলার ঢঙ, উপস্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কেও নিরালা সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করেন, 'কোনো প্রবাহমান ধারার প্রতিকূল কোনো সত্যের বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে কোনো উপন্যাস নতুন কিছু সৃষ্টি করে না, তা না সাহিত্যিক শক্তি আহরণ করে, না সমাজের প্রবাহমান জীবন হয়ে ওঠে।' এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে, 'বিল্লেসুর বকরিহা'কে বিনা দ্বিধায় হিন্দি উপন্যাসের এক নতুন অগ্রগতি বলা যেতে পারে।

'বিল্লেসুর বকরিহা'র আগে নিরালার উপন্যাস 'কুল্লীভাট'— 1939 সালে প্রকাশিত হয়। দেশজ স্টাইলে লেখা এ-দুটি উপন্যাসে হাস্যবিনোদ সমানভাবেই মজুদ আছে। কুল্লী এবং বিল্লেসুরের মতো চরিত্র নিরালার অত্যন্ত পরিচিত অবধের গ্রামীণ জনপদগুলিতে দেখা যায়। বিল্লেসুর বিল্লেশ্বরের বিকৃত রূপ। এর সঙ্গে জড়িত শব্দ 'বকরিহা' সংকেত করছে যে, চাকরি এবং ক্ষেতখামারি দিয়ে আর জীবন-জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হচ্ছে না। তাই ব্রাহ্মণ সমাজের 'তরী'র সুকুল বিল্লেসুর বকরি পুষে জীবিকা নির্বাহ শুরু করে। নিজের ব্যর্থতার জন্যে উপযুক্ত উত্তর খুঁজতে তার দেরি হয় না। মনকে বোঝায়, 'প্রয়োজন হলে ব্রাহ্মণকেও হাল ধরতে হয়, জুতোর দোকান খুলতে হয়। বকরি পোষা তাহলে এমন কী খারাপ কাজ?' পিতার মৃত্যুর পরে পরিবার ছত্রছান হয়ে গেলে বিল্লেসুর কলকাতায় রওনা হয়। বিনা টিকিটে গাড়িতে চড়ে। তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। নিরালা বলেন, 'বিল্লেসুর ভারতবর্ষের আবহাওয়া অনুযায়ী সবিনয়ে আইন অমান্য করছিল। কোনো কথা বলে না। নীরবে গাড়ি থেকে নেমে যায়। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকু সরে দাঁড়ায় না।' অবশেষে একদিন বর্ধমান মহারাজার জমাদার সত্রীদীন সুকুলের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সত্রীদীন ছিল কৌনজী ব্রাহ্মণ। বিল্লেসুরের চাইতে উঁচু কুলের। বিল্লেসুর সেখানে ডাক-পিওনের কাজ পায়। তাও স্থায়ী কাজ নয়। সুকুল-পত্নী বিল্লেসুরের কাছ থেকে আরও বেশি বেশি কাজ আদায় করার জন্যে রাখালদের কাজ থেকে সরিয়ে দেয়। বিল্লেসুর চমকে ওঠে। গরু-বাছুর চড়ানোর জন্যে সমুদ্দুর পার করে সে এমনি এত দূরে আসেনি? বিল্লেসুরের চরিত্রের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের দৃঢ়তা ছিল। ছিল অদম্য জীবনীশক্তি। সহ্য করার অভ্যেস

তার গ্রামেই হয়। নিরালার ভাষায় বলা যায়, 'কখনও কোনো টু শব্দটিও করেনি। নিজের জীবনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছে। যে কোনো বৈজ্ঞানিকের চেয়ে বড় নাস্তিক। সবাইকে অবিশ্বাস করতে করতে বিল্লেসুর এক বিশেষ ধরনের মানুষ হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজের শক্তিকে খুঁইয়ে বসে না, যেন একাকী সাঁতারু।'

বিল্লেসুর স্থায়ী চাকুরি এবং উন্নতির জন্যে কী কী না করেছে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। সন্তান কামনার জন্যে যখন সত্রীদীন সুকুল তার স্ত্রীকে নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে আসে, তখন বিল্লেসুর মিথ্যে স্বপ্নের কথা বলে গুরুমন্ত্র পর্যন্ত নেয়। গুরুমন্ত্র নিয়ে সুকুল-পত্নীর কামনা-বাসনা ফলপ্রসূ না হলে তার ভয়, আতঙ্ক এবং বিকার শুরু হয়। নিরালা লেখেন, 'গুরুপত্নীর বাস্তববাদ বিল্লেসুরের ভালো লাগে না।' একদিন কণ্ঠি তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে ফিরে এসে চাষ-আবাদ করার সঙ্কল্প নেয়। সঙ্গে বকরি নিয়ে আসে। গুরুমন্ত্র ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু বকরিদের কল্যাণ কামনায় মহাবীরের মূর্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করে। বিল্লেসুর জীবনের পথে প্রতিদিন হোঁচট খাচ্ছিল। এখন কিছুটা সামলে নিয়েছে। ওর দৃষ্টি ছিল সর্বদাই সামনের দিকে। নিরালার ভাষায় বলা যায়, আমাদের সক্রেতিসের মুখে রা ছিল না, কিন্তু তার ফিলসফি ফালতু ছিল না, শুধু কেউই তা কর্ণপাত করত না। এই গোলকধাঁধা থেকে বেরুনোর কোনো পথ ছিল না, তাই সে দিশেহারা হয়ে চক্কর কাটতে থাকে।'

জীবন-সংগ্রামের এই দ্বিতীয় ধাপে বিল্লেসুর যখন গ্রামে ফিরে আসে, তার মনে হয় 'তাকে শত্রুর ঘরে বাস করতে হবে।' বসবাসের জন্যে যে বাড়ি ঠিক করে, সে বাড়ি সম্পর্কে বলা হয়, 'বাড়ির সামনে আছে একটি এঁদো কুয়ো এবং একটি তেঁতুল গাছ। বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে দেয়াল এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গিয়েছে, যেন দেওয়ালে পাইপ লাগানো হয়েছে।' বকরিদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার মহাবীরের ওপর সঁপে দিয়ে সে কাজে বেরোয়। প্রকৃতির রূপ-রঙকে সে পছন্দ করত এবং প্রতিটি দৃশ্যকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। মরসুমের প্রথম একপশলা বৃষ্টি হয়েছে। মাটি ভিজে গিয়েছে। দীঘি-পুকুর, ডোবা— সব কিছু জলে টইটম্বুর। তুলো, ধান, জোয়ার-বাজরা, অরহর, পাট, শন, বটবটির চাষ করার জন্যে লোভী কৃষক দ্রুত হাল চালাচ্ছে। বিল্লেসুর কৃষক সমাজকে জানে। জেনেও প্রথম বর্ষার মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধে মত্ত হয়ে খাঁটি কিসানের কথা ভাবতে ভাবতে সে বকরিদের চড়াতে নিয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে মিষ্টি আলুর চাষের কথা ভাবে। ফিরে এসে বুঝতে পারে, মহাবীরের জিম্মায় রেখে-যাওয়া একটি বকরিকে কে যেন মেরে ফেলেছে। এ তার কাছে এক মর্মন্তুদ ঘটনা। জীবনের উদ্দেশ্য যেন মৃত্যুর বার্তায় পরিণত হয়। যে দৃশ্যে একসময়ে যে জীবনের পদধ্বনি শুনেছিল, সেই দৃশ্যই এখন কেমন ভয়ার্ত হয়ে উঠেছে। 'মানুষ ক্ষেত জুতে যেন ঘরের ছাতের নিচে পিষে মরার জন্যে ধীরে ধীরে ফিরছিল।' সে নিঃশব্দে মহাবীরের মূর্তির কাছে গেল এবং আবেশে তার মুখের

উপর আঘাত করে বলতে লাগল, ' দেখ, আমি গরীব। সবাই তোকে গরীবের বন্ধু বলে। তাই তোর কাছে আমি আসতাম, বলতাম, আমার বকরি আর বাচ্চাদের দেখভাল করিস। তুই কী দেখভাল করলি বল, কী ভাবে তোর থোতা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস?' এ হচ্ছে বিল্লেসুরের মূর্তি-ভাঙার ব্যক্তিত্ব। যে মূর্তির প্রতি সে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিল, সেই মূর্তির প্রতি তার ঘৃণা হলো। সমালোচক ড রামবিলাস শর্মা 'বিল্লেসুর বকরিহা'-কে শ্রীরামচন্দের শক্তি-পূজার বিকল্প বলে অভিহিত করেছেন।

উপন্যাসের তৃতীয় এবং শেষ অধ্যায়ে বিল্লেসুর যেন-তেন প্রকারেণ জীবনকে দৃঢ়ভাবে আগলে ধরে। বলা হয়, 'দুঃখের মুখ দেখতে দেখতে সে দুঃখের ভয়ঙ্কর চেহারাকে বারবার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। কখনও পরাজিত হয়নি।' কখনও খোয়া বানায়, কখনও খুরপি নিয়ে ক্ষেতে যায়। ধৈর্য এবং সাহস ছিল বলেই সে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পেরেছে। তাই সে বিয়ে করা স্থির করে। কেউ তাকে বিয়ের কথা বললে, সারা শরীরে তার একটা শিহরণ খেলে যেত। উপযোগিতার যথার্থ হিতৈষীদের সামনে নিজেকে পেশ করত। ঠকে যাওয়ারও ভয় ছিল। কিন্তু অন্যদিকে কনের রূপের মোহ তাকে আকৃষ্ট করত। অজস্র কলি পাঁপড়ি মেলেছিল, সৌরভ ছড়াচ্ছিল। বড় ভাই মন্নীর শাশুড়ির সঙ্গে পরিচয় হয়। বিল্লেসুরকে আশ্বাস দেয় বিয়ের ব্যবস্থা সে করবে। আনন্দের দিন ছিল। মিষ্টি আলুর ফলন দেখে খুশি হয় প্রকৃতির রঙও তার কাছে পাল্টে যায়— 'কার্তিক মাসের জোছনা চারদিকে ঢল হয়ে নেমেছে। গোলাপী শীত পড়ছে। সবন জাতের পাখিরা কোথা থেকে যেন উড়ে এসে শীতের তেঁতুল গাছের কচি ডালপালায় আস্তানা নিয়েছে। পাখির কলরবে চারদিক মুখরিত। প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট এবং আতঙ্কের মধ্যেও বিল্লেসুরের জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েনি। প্রকৃতিকে সে সহজ এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিল। নিরালা বলেন, 'বিল্লেসুর দাওয়ায় বসে রাত্রির দিকে চেয়ে থাকত। সন্ধ্যার সময় আকাশে প্রথমে যেখানে হরিণ-হরিণী দেখত, পরে দেখত সেখানে তারা নেই।' ক্লান্তি-পরাজয় থেকে মুক্ত বিল্লেসুর ভবিষ্যতের দিকে চোখ মেলে চাইত। ক্ষেতখামারির কাজে আগ্রহ বাড়তে থাকে। মিষ্টি আলুর ক্ষেতে কখনও কড়াইশুটি কখনও ছোলার চাষ করে। এই উড়ো খবরকে বিল্লেসুর কখনও খণ্ডন করেনি যে, তার কাছে সোনার ইটও আছে।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে নিরালা পুরোমাত্রায় হাস্যবিনোদ করেছেন। খাঁটি দেশজ প্রকৃতির জীবন্ত হাস্যবিনোদ। কাজ করতে করতে যখন বিল্লেসুরের মন্নীর শাশুড়ির আশ্বাসের কথা মনে পড়ত, তখন তার মন কোথা থেকে কোথায় চলে যেত। 'বিয়ের ফুল যেন পাঁপড়ি মেলতে থাকে, কাজ করতে করতে মন উদাস হয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়, লোম খাড়া হয়ে যায়।' বিভোর হয়ে পুজো করার সময়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখে— 'চোখ এবং ভুরু উঠিয়ে-নামিয়ে, গাল ফুলিয়ে চিপসে,

ঠোঁট ফুলিয়ে-বেঁকিয়ে।' বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় সুলক্ষণ দেখে— যেমন ভরা কলসি, যার কাঁখে ভরা কলসি ছিল, সে আনন্দে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মিষ্টি কবে আনছ?' প্রকৃতির সেসব রূপ নতুনভাবে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নিরালা প্রকৃতিকেও দেখেন এবং বিল্লেসুরের মানসিক গতিবিধিকেও। বিল্লেসুর এগিয়ে চলে। পথে শমসেরগঞ্জ পড়ে। এক জায়গায় কিছু খেজুর এবং তালগাছ চোখে পড়ে। সামনে সবুজ ক্ষেতে ঢেউ খেলছে। তাতে শিশির এবং সূর্যের কিরণ পড়েছে। চোখের সামনে নানা রঙ ফুটে উঠছিল— আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। মনের মধ্যে একটা শিহরণ সৃষ্টি হচ্ছিল। সে দ্রুত হাঁটছিল।' সামনে আম এবং মহুয়ার সারি সারি গাছ। সেই গাছের সারির ওপর সে চোখ বোলায়। চারদিকে শীতের সোনালী রোদ। নিরালার ভাষায়— 'সারা পৃথিবী যেন সোনার মতো মনে হচ্ছিল। গরীবীর রঙ উড়ে গিয়েছে।' এখন বিল্লেসুরের মন হাওয়ায় দুলতে দুলতে সবুজ তরঙ্গের সঙ্গে মিশে যায়। বিল্লেসুর বিয়ে পাকাপাকি করে গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে ফিরে তার মনে হলো সে যেন কেল্লাফতে করে এসেছে। আর প্রজারাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? নাপিত, কাহার, বেহারা, চামার, চৌকিদার— সবাই তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে এগিয়ে আসে। পাশের গায়ের জমিদার ঠাকুর বরযাত্রীর জন্যে নিজের ঘোড়া দিতে চায়, তখন বিল্লেসুর নিজের আত্মসম্মান বাঁচিয়ে বলে— 'আমি গরীব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মতোই যাব।' উপন্যাসের শেষ বাক্য— 'চারদিন পরে কনে নিয়ে বিল্লেসুর বাড়ি ফেরে। কিন্তু তার ধনী হওয়ার গোপন রহস্য সে বেঁচে থাকতে কারও কাছে খোলসা করেনি।' মূল কথা হচ্ছে সাহসের সঙ্গেই জীবনকে পরিচালনা করতে হয়। ধনী হওয়ার রহস্য শুধু রহস্যই ছিল। নিরালার উপন্যাসের এই সাদামাটা সমাপ্তি যদি পাঠককে আঘাত দেয়, তাহলে সে আঘাত এজন্যেই পাবে, কারণ বিল্লেসুরের সংগ্রাম এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। এবং খুব সম্ভব তার জীবনে এর বাইরে আর কিছু হওয়ারও ছিল না। এই সমাপ্তি যদি মনে শক্তি জোগায়, তাহলে তা এজন্যেই জোগাবে যে, অনেক ট্রাজেডি এবং ভয়ানক পরিবেশও বিল্লেসুরের গভীর জিজীবিষাকে ধ্বংস করতে পারেনি। উল্লেখ না করলেও চলে যে, বিশিষ্টতা এবং মহানতার মিথকে ভেঙে অতি সাধারণ বিল্লেসুর নায়ক হয়ে ওঠে। অন্যকে দেখে হাসার মানুষের অভাব নেই। বিল্লেসুর নিজে নিজেকে দেখে হাসে। বেশি বয়সে বিয়ের জন্যে উৎকট আগ্রহ এবং ব্যাকুলতা দেখে সে নিজে নিজে হাসে। সোনার ইট নিয়ে বহুল প্রচারিত গুজব নিয়েও সে হাসে। নিরালার ব্যঙ্গধর্মী বাস্তবতা— হাস্যবিনোদ এবং ট্রাজেডি এ দুটি রূপই এই উপন্যাস 'বিল্লেসুর বকরিহা'তে লুকিয়ে আছে।

নিরালা জানকীবল্লভ শাস্ত্রীকে চিঠি লিখতে গিয়ে 'কুল্লীভাট' সম্পর্কে বলেন, 'ভালো-মন্দ মিশিয়ে কিছু একটা হয়ে গেল।' তিনি আর একটি চিঠিতে লেখেন, 'চামেলীর' পরে 'বিল্লেসুর বকরিহা' 'রূপাভে' প্রকাশিত হবে। এ-সংখ্যাতেই,

পড়বেন। এ অনেক বেশি ভালো।' ১৯৩৯-৪১-এর মধ্যে নিরালা 'চামেলী' এবং 'বিল্লেসুর বকরিহা' লেখেন। তিনি 'চামেলী' সমাপ্ত করেননি, কিন্তু 'বিল্লেসুর বকরিহা'তে উপন্যাসের বাস্তবতার কাঠামোর এক নতুন উপমা স্থাপন করেন। 'বহিরঙ্গের এই রূপ' 'কালে কারনামে' উপন্যাসে এক নতুন রূপ নেয়। এখানেও সেই প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ এবং পরিস্থিতির জন্যে যে-আতঙ্ক, তার অনুভূতি আছে। 'কুল্লীভাট'-এ নিরালা কুল্লীর জীবন-চরিত আঁকতে চান এবং স্বয়ং উপন্যাসের একজন পাত্র হয়ে ওঠেন। 'বিল্লেসুর বকরিহা' সে-অর্থে জীবন-চরিত নয়। নিরালাও এই উপন্যাসের পাত্র নন। বিল্লেসুরের জীবনের সামান্য কিছু রূপরেখা তিনি চিত্রিত করেছেন, যাকে নিরালা তিনটি গল্পের সংমিশ্রণ বলেছেন। কিন্তু 'বিল্লেসুর বকরিহা'র সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উপন্যাসের নায়কের গভীর জীবনীশক্তির চিত্রণ, জনপদের প্রকৃতি এবং পরিবেশের রূপ-কাঠামোর মধ্যে মানব-স্বভাবের গভীর উপলব্ধি। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দেহাতি হিন্দির জাতীয় প্রকৃতির এই গদ্যরূপ, যার তার উপন্যাসের মধ্যে প্রবন্ধ, রেখাচিত্র, স্মৃতি, জীবনী হয়ে মিশে আছে। এক সময়ে হিন্দি উপন্যাসে আদর্শবাদ এবং সংস্কারবাদের চলন ছিল, কিন্তু নিরালার এই উপন্যাস এ-দু'ধারা সম্পর্কে সংশয় ব্যক্ত করে যথার্থ বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করে। নিরালার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সহজ-সরল আদর্শবাদ যুগ প্রবর্তনের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে উঠেছে। নতুন উপন্যাসের সন্ধানে নিরালা এক লড়াকু মেজাজকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় বলা যায়, 'রাজনৈতিক ময়দানে যে ধরনের বিরাট বিরাট লড়াইগুলির জন্যে ঘাড় টান করে দাঁড়াতে হয়, ঠিক তেমনি সাহিত্যের ময়দানেও দাঁড়াতে হয়। এই লড়াইয়ের দৃশ্য আমাদের সাহিত্যে বিশেষ একটা দেখা যায় না বলেই, সাহিত্যের মূলধারা উপন্যাসের এ-দুর্দশা। (সম্পাদকীয়, সুধা, মাসিক, লখনৌ, আগস্ট ১৯৩০)। নিরালা তাঁর উপন্যাসে এই নতুন রোষ তুলে ধরার জন্যে প্রায় এক দশক সময় নিয়েছেন। বিল্লেসুরের সাদামাটা জীবন-সংগ্রামের মধ্যেও এই বোধ নিহিত আছে। এবং তা যত প্রচ্ছন্নভাবেই থাকুক না কেন। মহাবীরের প্রতি তার গভীর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু বিশ্বাস ভেঙে গেলে, সেই মহাবীরকে প্রহার করা সামান্য ঘটনা নয়। আজকে, এই ঘটনার মর্মবস্তু আরও গভীর তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কখনও তা অনেক বেশি অর্থময় এবং কখনও প্রতীকধর্মী হয়ে ওঠে। 'বিল্লেসুর বকরিহা' উপন্যাসের সাধারণ রূপকে বিধ্বস্ত করে নতুন উপন্যাস-রূপের সন্ধান দেয়, যা হিন্দি সাহিত্যে জাতীয় রূপ নিয়ে জাতীয় ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, এই উপন্যাসকে এক নতুন যুগান্তকারী উপন্যাস হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

পরমানন্দ শ্রীবাস্তব

অনেক খোঁজ খবর করার পর জানা গেল, বিল্লেসুর নামের শুদ্ধ রূপ হচ্ছে 'বিল্বেশ্বর'। যে ডিভিসনের নাম পূরবা, সেখানে ঐ নামে শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই বিল্বেশ্বর শিবকেই স্থানীয় লোকেরা কথ্য ভাষায় বলে 'বিল্লেসুর'। অন্য কোথাও এ নাম পাওয়া যাবে না, সে জন্যে ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তা গৌরবময়। বকরিহা যেখানকার শব্দ, সেখানে বকরিহাকে বোকারিহা বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে 'বকরি'কে 'বোকরী' বলে। আমি এর হিন্দুস্তানী রূপ অনুসন্ধান করে পেয়েছি। 'হা'- এর প্রয়োগ হনন অর্থে নয়, পালনের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিল্লেসুর জাতিতে ব্রাহ্মণ, 'তরী'-র সূকুল; খেমেওয়ালার (তাঁবুতে যারা বাস করে) পুত্র যেমন খৈয়াম হয়, তেমনি বকরিওয়ালার পুত্র বকরিহা নয়। কিন্তু তরী-র সূকুলরা সংসার-সাগর পার হওয়ার জন্যে কোনো তরণী পায়নি, তাই বকরী পোষার ব্যবসা শুরু করে। গ্রামের মানুষ তাদের এই নামেই ডাকে।

হিন্দি ভাষা-সাহিত্যে রসের আকাল থাকতে পারে, কিন্তু, হিন্দিভাষীদের মধ্যে সেই রসের কোনো খামতি নেই। তাদের জীবনে রসের গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিত হয়। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ধারা ওদের প্রাচীন জীবনে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে শুধুমাত্র বিল্লেসুরের পরিবারই যথেষ্ট। বিল্লেসুরের চার ভাই আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের চার চরণ পূরণ করেছে।

বিল্লেসুরের পিতার নাম ছিল মুক্তাপ্রসাদ। এত শুদ্ধ নাম তার কেন ছিল, জানি না। মানুষটি পণ্ডিত ছিলেন না। মুক্তাপ্রসাদের চার পুত্র হয়—মন্নী, ললই, বিল্লেসুর ও দুলারে। চার সন্তানের নাম তিনি স্বয়ং রাখেন, আর তা ছিল শুদ্ধ নাম। কিন্তু গুণাগুণ অনুসারে ওদের ডাক নাম ছিল ভিন্ন। মন্নী যখন বছরখানেকের শিশু, তখন মন্নীকে ঘাড় টান টান করে দুলতে দেখে 'গপুয়া' বলে ডাকতে লাগলেন। আদর করে বলতেন 'গপ্পু'। দ্বিতীয় ছেলে ললই, তার গায়ের রঙ এমন ফরসা ছিল যে, গায়ের লোমগুলো পর্যন্ত ছিল সোনালী, আর চোখের মণি ছিল বেড়ালের মতো। স্বভাবও ছিল অন্যরকম। পিতা তাই নাম রাখলেন 'ভর্রা', আদর করে বলতেন 'ভুরু'। বিল্লেসুরের নামের মধ্যেই গুণ নিহিত ছিল। বাবা বলতেন 'বিলুয়া', আদর

করে ডাকতেন 'বিল্লু'। দুলারে তার ঈশ্বরের কাছ থেকেই খত্‌না (সুন্নত) করে এসেছিল, সেজন্যে পিতার নামকরণ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাকে 'কটুয়া' বলে ডাকতেন, আদর করে বলতেন 'কট্টু'।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, পুত্র সন্তানরা বড় হওয়ার আগেই মুক্তাপ্রসাদ সংসারের সমস্ত বন্ধন—সমস্ত মায়া-মমতা কাটিয়ে পরপারে চলে যান। তাঁর স্ত্রী সন্তানদের প্রতিপালন করে বড় করতে লাগলেন। জাঁতা চালিয়ে, বাসন মেজে, ঘুঁটে দিয়ে, গরু-ছাগলের দেখাশোনা করে, ছোট বাগিচায় আম-মহুয়া কুড়িয়ে, ছেলেদের চাষ-আবাদের কাজ শিখিয়ে-পড়িয়ে তিনিও স্বর্গে চলে গেলেন। অতঃপর চার ভাইয়ের মধ্যে আর হৃদ্যতা-মিলমিশ রইল না। ঝগড়া-ঝাঁটি তাদের কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগল। ফলে চার ভাইয়ের মধ্যে দুটি ভাগ হল। মন্নী আর বিল্লেসুর রইল একসঙ্গে, আর ললই এবং দুলারে রইল একসঙ্গে—যেন সনাতন ধর্মী আর আর্য সমাজীর দুটি ভাগ। কিছুদিন এভাবেই কাটল। তারপর একই ডালে শাখা-প্রশাখা গজাল,—বৈষ্ণব এবং শাক্ত, বৈদিক এবং বিতণ্ডাবাদীর শাখা-প্রশাখা। ফলে তারা যে-যার মতো আলাদা হয়ে গেল।

সনাতন ধর্মানুযায়ী মন্নী দুঃখী হল। কারণ 'তরী'-র সূকূল হওয়ার জন্যে কেউ তাকে কন্যা দিতে চাইল না। কিন্তু বিয়ে তো তাকে করতেই হবে, আর তা ইহলোকের জন্যেও প্রয়োজন, পরলোকের জন্যেও প্রয়োজন। বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন, জলাঞ্জলি হয়তো সে পেত, কিন্তু পিণ্ডি দেবে কে? গৃহিণী না থাকলে গৃহে ভূত আস্তানা গাড়ে। মন্নী যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করত, সেই চিন্তা-ভাবনা অনুসারেই সে কথাবার্তা চালাচ্ছিল। আর যেখানেই কোনো অনাথ মেয়ে দেখত, সেখানেই প্রস্তাব নিয়ে হাজির হত। এক জায়গায় সব পাকাপাকি হয়ে গেল। না বললেও চলে, এ-ধরনের বিয়ে-থার কথাবার্তায় অতিরঞ্জিত কথাই বেশি হয়। অর্থাৎ, মিথ্যে কথাই বেশি হয়, পয়সার কথা উঠলে এক-পয়সাকে লাখ টাকা করা হয়। মন্নীর বিয়েতে সেই ঘটনাই ঘটল। মেয়ে সবে মা-র বুকের দুধ ছেড়েছে, মা বিধবা, তাকে বলা হল দু'-তিনশ' টাকা নিয়ে কী করবে, মেয়েকে এখনও দশ বছর পেলে-পুষে বড় করতে হবে, বরং আমার সাথে চল, মেয়ের সাথে থাক, দুধ-ঘি খাও, আর রাজরানীর মতো থেকে মেয়েকে বড় করে তোল। কথাটা মা-র মনে ধরল। মন্নীর বয়স তখন তিরিশ বছর। দেখতে ছোট-খাটো বলে, বয়স বলা হল আঠারো-উনিশ। গোঁফও তেমন পুরুষ্টু ছিল না। ওরা তার কথা বিশ্বাস করল।

মন্নীর খেতের পাশে একটা ঝোপ ছিল। মন্নী বলে, এই ঝোপে ভগবান ঝাড়খণ্ডেশ্বর থাকেন। একদিন সন্ধ্যার সময় মন্নী ধূপ-ধুনো-চন্দন ফুল নিয়ে দেবতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পুজো করতে করতে বিড়বিড় করে কী কী না বলল। পুজো করে ফিরে প্রসাদ খেয়ে শুয়ে পড়ল। আর গভীর রাত থাকতেই পূরবার দিকে রওনা হল। সপ্তাহ খানেক পরে মাথায় বেগুনি রঙের পাগড়ি বেঁধে একজন বিধবা

আর তার মেয়েকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এল। পথে জমিদারের খামার পড়ল, শাশুড়িকে খামার দেখিয়ে বলল, এ সব কিছুই আমার। শাশুড়ি অনেক কষ্টে তার আনন্দাশ্রু রোধ করল। গ্রামের বাগিচা দেখা গেল, মন্নী হাত তুলে দেখিয়ে বলল, ঐখান থেকে শুরু করে সব আমার বাগান। শাশুড়ির আর কোনো সন্দেহ থাকল না। বুঝতে পারল, মন্নী একজন মালদার মানুষ। বাড়ি প্রায় ভেঙে পড়েছিল। ভাইদের সঙ্গে মন্নী এক উজাড় জায়গায় বাস করত। কিন্তু ওর মুখে ছিল কথার ফুলঝুরি, একটি ধ্বাংসাবশেষকেও ও প্রাণবন্ত করে তুলত। বাড়িতে পৌছনোর আগে, পথে জমিদারের মহল দেখিয়ে বলল, আমার আসল বাড়ি হচ্ছে এটা, কিন্তু এখানে ভাইরা থাকে। আপনাকে একান্তে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে আরামে থাকবেন, এখানে আপনি মান-সম্মান পাবেন না। ঐ একান্তেই মহল তৈরি করে নেব। শাশুড়ি সশ্রদ্ধভাবে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, ঠিকই বলেছ, বাইরের লোকজনের মধ্যে থাকা ঠিক নয়।' মন্নী শাশুড়িকে ধ্বংসাবশেষে নিয়ে গেল। সে দিন সে পাঁচ সের দুধ নিয়ে এল। শাশুড়ি লজ্জিত হল, বলল, 'এতো দুধ কে খাবে?' মন্নী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, ফুটিয়ে ঘন করলে আর কতোটুকু হবে, তিনজন মানুষ আছি—দুধ খুব বেশি নয়, এখন একটু দুধ চিনি দিয়ে শরবত করে খাব। শাশুড়ি নিশ্চিন্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মন্নী ভাঙ খেত, ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে ভাঙের একটা গোলা পিষে, তৈরি করে নিঃশব্দে নিয়ে এল। দুধে চিনি মিলিয়ে ভাঙের গোলা ঘুটে নিল। ভাঙের মধ্যে বাদামের মাত্রা একটু বেশিই ছিল, শাশুড়ি অমৃতের স্বাদ পেল,— এক নিঃশ্বাসে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। মন্নী সামান্য একটু ভাঙের শরবত ভাবি স্ত্রীকে খাইয়ে দিল, তারপর নিজে খেল। শাশুড়ি হাত পা ধুয়ে বসল, মন্নী লুচি ভাজতে লাগল। নেশা না চড়া পর্যন্ত মন্নী কাজ করল। লুচি তরকারি দুধ চিনি মিষ্টি টক খুব তৎপরতার সঙ্গে মন্নী শাশুড়িকে বেড়ে দিল। শাশুড়িকে সে বুঝিয়ে দিল, অনেক তপস্যা করে সে ফল লাভ করেছে। শাশুড়ি পেট ভরে খেল। মন্নী খাট পেতে বিছানা করে দিল। মা এবং মেয়ে শুয়ে পড়ল। মন্নী খাওয়া দাওয়া সেরে ঈশ্বরের নাম জপ করতে লাগল। মাঝরাতে খুব জোরে জোরে গলা খাঁকারি দিল, কিন্তু শাশুড়ি গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল, তারপর দরজায় টোকা মারল, কিন্তু শাশুড়ি পাশ ফিরেও শুল না। মন্নী বুঝতে পারল, ভোরের আগে ঘুম ভাঙবে না। সে তার ভাবি স্ত্রীকে কোলে তুলে নিল, তুলে নিয়ে ভগবান বুদ্ধের মতো সংসার ত্যাগ করল। স্ত্রী ওর বুকের মধ্যেই ঘুমিয়ে রইল। ভোর হওয়ার আগেই মন্নী সাত ক্রোশ পথ পার হয়ে যেখানে তার আত্মীয়স্বজন ছিল, তাদের কাছে উঠল। ভোরে শাশুড়ি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। শাশুড়ির চিৎকার চেঁচামেচিতে গাঁয়ের মানুষ ছুটে এল। ঘটনাটা সবার কাছে খোলসা হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে পাখি উড়ে গিয়েছে। বিধবা মাথা কুটতে কুটতে অভিশাপ দিল, 'তুই মর, গঙ্গা তোকে নিক।' তারপর সে নিজের বাড়িতে চলে গেল। মন্নী শুভদিন দেখে কোনোরকম হৈ চৈ না করে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে ভিন

দেশে চলে গেল। দশ-বারো বছর ধরে স্ত্রীর খুব সেবাযত্ন করল। স্ত্রীর যখন বছর কুড়ি বয়স, সে-সময় ধর্মরক্ষার জন্যে মন্নী স্ত্রীকে মার কোলে কন্যাসন্তান রেখে যাবার মতো ফেলে রেখে স্বর্গে চলে গেল। মন্নী ছিল কট্টর সনাতনপন্থী।

ললাই-এর জীবনে ভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে। প্রথমে সে কলকাতা-বোম্বাই-এ যায়। ঘুরে ফিরে দেখে অবশেষে সে রতলামে আসে। এখানে সে বসবাস করতে লাগল। রতলামে একজনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। সে নিজেকে গুজরাটের ব্রাহ্মণ বলত। ঈশ্বরের অপার কৃপায়, বন্ধু অল্পদিনের মধ্যে চোখ বোজে। বাধ্য হয়েই ললই বন্ধুর পরিবারের সমস্ত ভার নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়। বন্ধুর পরিবারে ছিল বন্ধুর স্ত্রী, দু' ছেলে এবং বড় ছেলের স্ত্রী। বন্ধুর সঙ্গে ললই-এর যে আত্মীয়তা যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গেও তার সেরকম আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বন্ধুর এই পরিবারের কাছে বেশ কিছু ধনদৌলত ছিল, সেজন্যে ললই ভিন দেশে থাকার চেয়ে নিজের দেশে থাকা ঠিক মনে করল। সে তার নিজের ধর্ম-কর্মে অটল ছিল, তাই পরনিন্দা বা প্রশংসার মধ্যে সে কোনোরকম ফারাক দেখত না। ললই এদের সবাইকে নিয়ে তার গ্রামে এল। বন্ধুর স্ত্রী, তার দু' ছেলে এবং পুত্র বধূকে দেখে লোকে অবাক হল। এমত অত্যাশ্চর্য জিনিস তারা কস্মিনকালেও দেখেনি। কখনও শোনেও নি। গাঁয়ের লোক যার পেছনে পড়ে তার নিস্তার পাওয়া কঠিন। তাই সে নিস্তারের আশা ছেড়ে দিয়েই গ্রামে এসেছিল।

গাঁয়ের লোক ললই-এর সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ করে দিল। ললই মনে মনে ভাবল, যাক্ একটা খরচ অন্তত বেঁচে গেল আর গাঁয়ের লোক ভাবল, ইস, কী বেকুবটাই না আমাদের বানিয়েছে, মালকড়ি নিয়ে এসেছে, অথচ একটা কানাকড়িও খরচ করল না। ললই নির্বিকারভাবে নিজের পথে যায়, আসে। একটা সুযোগের অপেক্ষায় সে রইল। ঠিক সেই সময় আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। ললই দেশ উদ্ধারের কাজে নেমে পড়ল। বড় ছেলে গুজরাটের কোথাও চাকরি করত। সে ঘর-খরচ পাঠাত। গ্রামের লোক প্রভাবিত হল। ললই-এর তেজের কাছে তাদের অসহযোগ টিকল না। সবাই মিলেমিশে থাকার কথা বলতে লাগল। ললই ছিল রাজনৈতিক সংস্কারপন্থী— সামাজিক মানুষ।

বিল্লেসুরের কী হয়েছিল, তা পরে লিখব। বিল্লেসুরেব মধ্যে বিল (অর্থ-খন্দ) এবং ঈশ্বর—এই দুটি সত্তাই একসঙ্গে অধিষ্ঠান করছিল।

দুলারে ছিল আর্যসমাজী। বস্তীদীন সুকুলের যখন পঞ্চাশ বছর বয়স, সে-সময় সে একজন বিধবাকে নিয়ে আসে। বিধবাকে নিয়ে আসার বছরখানেকের মধ্যেই সে মারা যায়। দুলারে বিধবাকে বোঝাল, স্বামী যদি তিন বছর বা তিনমাস স্ত্রীর কোনো খবরা-খবর না নেয়, তবে স্ত্রীর দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করার অধিকার আছে। আর বস্তীদীন যখন জীবিত নেই, তখন তার তৃতীয় স্বামী গ্রহণ করার পরিপূর্ণ

স্বাধীনতা আছে। আর সে যদি চায়, তবে দুলারে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। মেয়েমানুষের একজন অবলম্বন তো চাই। বিধবা রাজি হয়ে গেল। কিন্তু দুলারেও বছর খানেকের মধ্যে সংসারের মায়া কাটিয়ে পরপারে রওনা দিল। দুলারের স্ত্রী গর্ভবতী ছিল, একটা বাচ্চা হল। বাচ্চা এখন নারদের মতো ললই-এর বাড়ির দোরগোড়ায় বসে খেলা করে। তার মা-ও আর বেঁচে নেই।

দুই

মন্নী যে পথ দেখিয়েছিল, বিল্লেসুর সেই পথ ধরেই এগোলো । গ্রামে শুনেছিল, বাংলার পয়সা টেঁকে,বোম্বাইয়েব পয়সা থাকে না, সেজন্যে সে বাংলায় যাওয়া মনস্থ করল। পাশের গ্রামের কয়েকজন বর্ধমানের মহাবাজার কাছারিতে সিপাই-আর্দালী এবং জমাদারের কাজ করত। বিল্লেসুর সাহসে বুক বেঁধে ঠিক করল, সে-ও বর্ধমানে যাবে। কিন্তু বর্ধমানে যাওয়ার খরচ-খবচা তার কাছে ছিল না। কিন্তু যে প্রগতিশীল তাকে কে রুখতে পারে। যদিও সে-সময় বলশেভিজমের নাম খুব অল্প মানুষই শুনেছিল, বিল্লেসুর তো জানতই না, কিন্তু বলশেভিজমেব আইডিয়াটা আপনা আপনিই তার মাথায় এসে গেল। সে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় কানপুরে আসে। টিকিট না কেটেই সে কলকাতাগামী একটি গাড়িতে উঠে বসে। এলাহাবাদে পৌঁছতে না পৌঁছতে চেকার তাকে কান ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়। তখন ভারতবর্ষে যে হাওয়া বইছিল, সেই হাওয়া অনুযায়ী বিল্লেসুর সবিনয় আইন ভঙ্গ করতে লাগল, গাড়ি থেকে নিঃশব্দে নেমে এল। কিন্তু সে তাব সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকু টলল না। প্লাটফরমের ওপর পায়চারি করতে করতে কী করবে ভাবতে লাগল। পূর্বাভিমুখী দ্বিতীয় গাড়ি যখন এল, সে সেই গাড়িতে উঠে বসল। মোগলসরাইয়ে তাকে আবার নামিয়ে দিল, কিন্তু দু-তিনদিন ধরে এ-ভাবে ওঠা নামা করতে করতে অবশেষে সে বর্ধমানে এসে পৌঁছল।

পণ্ডিত সত্তীদীন সুকুল বর্ধমানের মহারাজার কাছারিতে জমাদার ছিল। বাঙালীদের উচ্চারণে 'সত্তীদীন' শব্দ ঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না, তাই তারা সত্যদীন বা সতীদীন বলে ডাকত। কিন্তু তাতে সত্তীদীনের উন্নতিতে কোনো বিঘ্ন হয়নি। নিজের অপার মূর্খতার জন্যে সত্তীদীন মহারাজার খাজাঞ্চী হয়— তবে পুরো নয়, অর্ধেক । অর্ধেক, কারণ তালাচাবি থাকত সত্তীদীনের কাছে, আর খাতা লিখত অন্য একজন বাবু। সত্তীদীনের বিশ্বাস ছিল, সে মহারাজার একান্ত বিশ্বাসী। মহারাজার

কাছারিতে যে-সব হিন্দুস্তানী কর্মচারী ছিল, তাদের ওপর তার এই পদমর্যাদা প্রভাব ফেলে। বিল্লেসুর অনেক ভেবে-চিন্তে তারই শরণ নেয়। সত্তীদীন থাকত সস্ত্রীক। গোটা দু-তিনেক গরু ছিল। স্ত্রী ছিল 'শিখরীদশনা', অর্থাৎ সামনের দুটি দাঁত বেশ উঁচু। ঠোঁট দিয়ে তা গোপন করতে পারত না। সত্তীদীন ছিল পৈকুব সুকূল,— কান্বকুব্জীয় ব্রাহ্মণ। তাই কুলের দিক থেকে সে ছিল বিল্লেসুরের চেয়ে উঁচু। সেজন্যে সমস্ত দিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে বিল্লেসুর এখানে নিজেকে সুরক্ষিত মনে করল।

বিল্লেসুর সত্তীদীনের বাড়িতে আশ্রয় নিল। দারিদ্র্য কতো ভয়াবহ তা সে জানে। তাই পা টিপে-টিপে, না-খেয়ে, নত হয়ে, মাটির দিকে চোখ নামিয়ে দিন কাটাতে লাগল। উঠতি-যৌবনে সত্তীদীনের স্ত্রী তাকে প্রশংসা করার মতো একজন লোক পেয়ে গেল। দু-তিন দিন বিল্লেসুরকে খাওয়ানো তার গায়ে লাগল না। একদিন বিল্লেসুর অন্দর মহলে গেল। নাকিসুরে সত্তীদীনের স্ত্রী বলল, 'বিল্লেসুর, আমি বলছি কি, তুমি যখন এসেছ, আর এখানেই থাকবে, তাহলে এই রাখালদের বিদেয় করে দিই, কি বল? হারামের পয়সা খাচ্ছে। কী এমন কাজ আছে? মাঠ ভর্তি ঘাস, দু-এক বোঝা কেটে আনতে হবে। বিচালি আঁটি করে বাঁধা আছে, এখানে দেশ-গাঁয়ের মতো বিচালি নয়, বড় বড় করে কেটে দেবে। একটু ছানি মেখে দিতে হবে, দেশ-গাঁয়ের মতো পাঁচন হাতে এখানে গরু খেদাতে হবে না, লম্বা দড়ি আছে,—তিনটেই তো গরু, মাঠে লক লক করছে ঘাস, খোঁটা পুঁতে বেঁধে দেবে, চরে খাবে। সন্ধ্যের সময় বাবুর মতো টহল দিতে দিতে গরুকে নিয়ে আসবে। দুধ দুয়ে নেবে, রাতে মশা লাগে, ভেজা খড়ের ধোঁয়া দেবে—তেমন কোনো কাজ নয়, বলতেই আমার যা সময় লাগল।' বলে সত্তীদীনের স্ত্রী ঘাড় ফেরাল এবং ঠোঁট বন্ধ করার চেষ্টা করল।

বিল্লেসুর সচকিত হয়ে উঠল। সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সে এখানে গরু-ছাগল চরানোর জন্যে আসেনি। একাজ গ্রামেও করতে হয়। কিন্তু এ হচ্ছে বিদেশ-বিভূঁই। এখানে তার আপনজন বলতে কেউ নেই। অন্যের সাহায্যে পার হতে হবে। ভাবল, যতদিন কাজ না জোটে, ততদিন না হয় এ কাজ করি। চাকরি বাকরি যদি না পাই, বাড়ি ফিরে যাব।

জবাব দিতে বিল্লেসুরের দেরি হল না। সত্তীদীনের স্ত্রী তার দিকে ঘাড় ফেরাতে না ফেরাতে, বিল্লেসুর বলল, 'এমন কী বিরাট কাজ! কাজ করার জন্যেই তো সাত শ' ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি— দেশ সাত শ' ক্রোশ দূর তো হবেই, তাই না?'

বিল্লেসুর দেশের দূরত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত থাকায় সত্তীদীনের স্ত্রী বলল, 'বেশিই হবে।' একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কানপুর থেকে বর্ধমানের দূরত্ব... জমাদার এলে জিজ্ঞেস করব, ওর বইয়ে সব লেখা থাকে।

বিল্লেসুর আর কোনো কথা বলল না। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ

করতে লাগল।

সন্ধ্যের সময় জমাদার এল। খাবার তৈরিই ছিল। জমাদারের স্ত্রী জমাদারের পা ধুয়ে দিল। জমাদার পিঁড়িতে বসল। স্ত্রী দিনে মাছি তাড়ায়, আর রাতে জমাদারের সামনে বসে। জমাদার খেতে আরম্ভ করল। স্ত্রী বলল, 'বিল্লেসুর বলছিল, দেশ এখান থেকে সাত শ' ক্রোশ দূর, আমি বলেছি, তার চেয়ে বেশি। তোমার বইয়ে তো সব লেখা আছে?'

সত্তীদীন একটা ডায়েরি পেয়েছিল। ডায়রিও সেই বাবুই লিখত। লেখার বিষয়বস্তু ছাড়াও ডায়রিতে আর কি কি লেখা আছে, তা মাঝে মাঝে সত্তীদীন সেই বাবুকে দিয়ে পড়িয়ে বুঝে নিত। সত্তীদীন ভাবে, মহারাজ তো তাকে উঁচু পদ দিয়েছেন, সংসারও তার হাতের মুঠোয় কুলের মতো। কখনও কখনও এ-ডায়রি সে বাড়িতে নিয়ে এসেছে, সেখানে যা কিছু শুনেছে—মনে থেকেছে, তা সে তার স্ত্রীকে শুনিয়েছে।

বাঁ-হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে মুখের গ্রাস গিলে জমাদার বলল, 'এলাহাবাদ পর্যন্ত সাত শ' ক্রোশ পথ পুরো হয়। তার স্ত্রী জ্বলজ্বলে চোখে বিল্লেসুরের দিকে তাকাতে লাগল। বিল্লেসুর হার মেনে বলল, 'বইয়ে যখন লেখা আছ, তাহলে ঠিকই আছে।'

হোমরাচোমরা মানুষদের মন-মেজাজ পরখ করার পর, যেভাবে কথা পেশ করা হয়, স্বামীকে প্রসন্ন দেখে সত্তীদীনের স্ত্রীও সেভাবে আর্জি পেশ করল। বিল্লেসুর হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

সত্তীদীন একটা বিকল্প পথ বের করল। বলল, 'একথা ঠিক, বিল্লেসুর আমাদের নিজের লোক। আর একথাও ঠিক যে, ঐ ছোকরাদের চেয়ে ওর খোরাক একটু বেশিই। আমরা ওকে মাইনে-কড়ি দেব না,— দু'বেলা খাবে। তার জায়গায় তহসিলের জমাদারকে বলে দেব, সে যেন গোমস্তাদের কাছে লেখা তহসিলের চিঠি বিল্লেসুরকে দেয়। চিঠি পৌঁছে দিতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। মাসে চার-পাঁচ টাকা পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজও করবে।'

বিল্লেসুরের উপকার করল ভেবে, সত্তীদীনের স্ত্রী তার চোখে-মুখে সে-ভাব ফুটিয়ে তুলে বিল্লেসুরের দিকে তাকাল। খোরাক আর মাসে চার-পাঁচ টাকা হাতে আসবে ভেবে, বিল্লেসুর মনের খুশী মনেই চেপে রাখল। এতটুকুন পেলেই সে অনেক কিছু করতে পারবে। ভাবতে ভাবতে সে সত্তীদীনের স্ত্রীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল।

জমাদার খাওয়া শেষ করে গম্ভীরভাবে উঠল। তারপর আঁচাতে লাগল।

তিন

বিল্লেসুর জীবন সংগ্রামে নেমে পড়ল। গরুর কাজ যে অনেক, তা তাকে আগে বলা হয়নি। গোবর তোলা, গোবর তুলে সে-জায়গা নিকানো, চোনার ওপর ছাই ছিটিয়ে দেয়া, গোবর ছেনে ঘুটে দেয়া, কখনও কখনও গরুকে স্নান করানো—ইত্যাদি অনেক কাজ। আদতে কোনো ফুরসুৎই পাওয়া যেত না। সত্তীদীন যেমন বলেছিল, তেমনি কাছে পিঠের চিঠি দেয়ার কাজ সে শুরু করে দিল। এক একটা চিঠির জন্যে তিন-তিন আনা পেত। চিঠি বিলির কাজ সে করতে লাগল। কিছুদিন পরেই বিল্লেসুর জানতে পারল, দূরের চিঠির জন্যে দ্বিগুণ পয়সা পাওয়া যায়। সে তহসিলদারকে অনুরোধ করল, তাকে দূরের চিঠি দেয়ার জন্যে। তহসিলের জামাদার বলল, 'তুই এখানকার কর্মচারী নস, বদলিও নস, তাছাড়া সত্তীদীন নিষেধ করে দিয়েছে, দূরের চিঠি আমি তোকে দেব না। বিল্লেসুর তহসিলদারের পায়ে পড়ল, 'চাকরি দিলে তো আপনিই দেবেন, যতদিন চাকরি না হচ্ছে, ততদিন দূরের চিঠি আমাকে দিন। আমি বারো ক্রোশ পথ ছ'ঘণ্টায় যাব আর আসব।' জমাদার বিল্লেসুরকে চিঠি দিতে লাগল।

চিঠি পৌঁছনোর কাজ সত্তীদীনের স্ত্রী পছন্দ করছিল না। চিঠি দিয়ে ফিরে এলে সে বিল্লেসুরের দিকে তীব্র চাহনি হানত। যদিও গরুর কাজে বিল্লেসুর কোনো ত্রুটি রাখত না। সকাল দশটার মধ্যে সমস্ত কাজ সেরে সে বেরুত। ফিরে এসে গরুকে খুলে আনত, আর রাত নটা পর্যন্ত গরুর পেছনে লেগে থাকত। কিন্তু তাতেও সত্তীদীনের স্ত্রী সন্তুষ্ট ছিল না। অন্য কোনো চাকরও রাখল না, কারণ বিল্লেসুর ছিল মুফতের চাকর। কখনও কখনও সত্তীদীনের স্ত্রী এমন জ্বালা-ধরা কথা বলত, যা বিল্লেসুরের মোটেই ভালো লাগত না। ওর পেটের ভেতর থেকে যেন অন্ত্র বেরিয়ে আসতে চাইত। এ-সব কিছুই বিল্লেসুর সহ্য করে নিত। গ্রীষ্মকালে বেলা দশটা-বারোটা পর্যন্ত বাড়ির কিছু কাজ সে সারত। তারপর চিঠি পৌঁছনোর কাজে দেরি হয়ে গেছে দেখে, ছাতা না নিয়েই ঠা ঠা পোড়া রোদ্দুরে ছুটত। চিঠি পৌঁছে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরত। তখন গলা শুকিয়ে কাঠ, ঠোঁট দুটো যেন জোড়া লেগে গেছে, ঘামে নেয়ে উঠেছে, বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। বাড়ির বাকি কাজ এখনও পড়ে রয়েছে—সারতে হবে। বাড়িতে ফিরে মাটিতে একটু বিশ্রাম করতে বসলেই সত্তীদীনের স্ত্রী জিজ্ঞেস করত, 'বিল্লেসুর কতো কামালি?' কথা তো নয়, যেন ধারালো ছুরি জবাই করছে। কিন্তু এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও বিল্লেসুর একটা ওপর দেখানো নরমভাব এনে, দাঁত কেলিয়ে জবাব দিত। তারপর একটু জিরিয়ে গরুর নানা কাজে লেগে যেত।

সে-সময় বিল্লেসুর অনেককে বলেছে, পুরুষের চেয়ে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো

ঢের ভালো। কিন্তু কেউ তার এই কথার মর্মার্থ বুঝতে পারেনি। বিল্লেসুর শুকনো মুখে পরাজয়ের হাসি হেসে চুপ করে যেত।

দেশের বাড়িতে থাকতেই বিল্লেসুর সব দুঃখকষ্ট সহ্য করতে শিখেছিল। মুখ ফুটে কোনো প্রতিবাদ করেনি। শুধু নিজের জীবনের গ্রন্থ পাঠ করতে লাগল। যে-কোনো বৈজ্ঞানিকের চাইতে সে ছিল ঘোর নাস্তিক।

অন্যকে অবিশ্বাস করতে করতে বিল্লেসুর এক বিশেষ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। কিন্তু নিজের উপর সে আস্থা রেখেছিল, নিঃসঙ্গ সাঁতারু যেমন রাখে। সত্তীদীনের স্ত্রীকে মুহূর্তের জন্যেও সে বুঝতে দেয়নি, দূরের চিঠি পৌঁছে দিয়ে সে টাকা কামাচ্ছে। বারো ক্রোশ পথ ছোটা তার কাছে ছ' ক্রোশের পথ বলে মনে হত। পৃথিবীকে খুশী করার মন্ত্র সে জানে। দম বন্ধ করে— সব কিছু সহ্য করে সে কয়েক মাস পার করল। একদিন জমাদারকে হাসি-খুশী দেখে বিল্লেসুর বলল, 'দাদু, আমাকে যদি এখন চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে।'

জমাদার বলল, 'বেশ, কালকে তোর মাপ নেব।'

বিল্লেসুর মন্নীরই ভাই, উচ্চতা পাঁচ ফুটের কিছু বেশি। জানত, এ উচ্চতায় নাকচ হয়ে যাবে। একটা উপায় সে বের করল। চামড়ার জুতোর সোল ছিল দেড় ইঞ্চির চেয়ে সামান্য বেশি। তাই সে শুকতলার ওপর পুরু করে তুলো পেতে নিল। জুতো পায়ে গলিয়ে যখন দাঁড়াল, যেন থান ইঁটের ওপব দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটুও মুষড়ে পড়ল না, ভয়ও পেল না, যেন কর্তব্য পালন করছে, তেমনিভাবে দাঁড়াল। কাছারিবাড়িতে মাপকাঠি দিয়ে মাপজোখ করা হচ্ছিল। বিল্লেসুর চোখ তুলে তাকাল, ম্যাপজোখ শেষ হয়ে গিয়েছে। যে মাপজোখ করছিল, যে বিল্লেসুরকে বলল, 'দেড় ইঞ্চি কম।'

বিল্লেসুর জামাদারের দিকে এক নজর তাকাল। কাকুতি-মিনতি করল। জমাদার মুচকি হাসল। হেসে বলল, 'বিল্লেসুর, তোমার চাকরি হবে না, কিন্তু কোনো না কোনো সিপাই ছুটিতে থাকেই, সে-কাজ তুমি নিয়মিত পাবে, বিনা বেতনে যারা ছুটি পায়, সে-কাজেও তুমি টাকা পাবে।'

বিল্লেসুর তার উন্নতির কথা ভেবে মিষ্টি হাসল।

এভাবে একটা বছর কেটে গেল।

চার

সত্তীদীনের স্ত্রী এখানে আসার পর কয়েকবছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে জগন্নাথ দর্শন করেনি। একদিন সে জমাদারকে বলল, 'জমাদার, আমাদের টাকাকড়ি আছে, কিন্তু কোনো ছেলেপুলে নেই। আমাদের পরে এ টাকা-পয়সার কী হবে? এতদিন হল এসেছি, এখনও জগন্নাথ দর্শন করিনি। ভাবছি, বাবাকে দর্শন করি, আর তাঁকে বলি, বাবা আমাকে সন্তান দাও, সন্তান দিলে তোমার শ্রীচরণে ফিরে এসে তোমার দেওয়া একশ' এক টাকার পুজো দেব। আমার মন বলছে, বাবা আমার মনোস্কামনা পূরণ করবে। দেশ-দেশান্তরের মানুষ তাঁর কাছে যায়, তারা যা চায় তিনি বর দেন, তিনি তো ভগবান... যা করেন, তা-ই যথেষ্ট।' তারপর কী জানি কী ভেবে সত্তীদীনের স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অবশেষে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে হেঁচকি তুলে বলল, 'আমি সব সুখ পেয়েছি। যেমন স্বামী পেয়েছি, তেমনি ঘর-পরিবার পেয়েছি। ধন, মান-মর্যাদা, গয়না-গাটি, জামা-কাপড় কী পাইনি! প্রচুর দুধ আছে, কিন্তু...' বলতে বলতে আবার কাঁদতে লাগল, অর্থাৎ ছেলেপুলে নেই।

সত্তীদীন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার এখন এমন কি বয়স হয়েছে। আগের পক্ষের হলে, না হয় অন্য কথা ছিল। সে বেচারি তো জাঁতা ঘোরাতে-ঘোরাতে মারা গেল। পাঁচ বছর হল তোমাকে বিয়ে করে এনেছি। এখন তোমার বয়স কত হবে, বিশ বছর— তাই না?'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সত্তীদীনের স্ত্রী বলল, 'উনিশ চলছে।' আসলে ওর বয়স পঁচিশ বছরেরও বেশি ছিল।

'তা হলে?' সত্তীদীন বলল, 'এতো উতলা হচ্ছ কেন? আমি এখনও বুড়ো হইনি। ছেলেপুলে যখন আসে, তখন বলে কয়ে আসে না।'

'এমন কথা মুখে এনো না।' সত্তীদীনের স্ত্রী বলল, 'বলো, জগন্নাথের কৃপায় আসে।'

সত্তীদীন গম্ভীর হয়ে যায়। বলল, 'সবদিকেই জগন্নাথের কৃপা দৃষ্টি আছে। জগন্নাথের কৃপাতেই উঁচু পদ পেয়েছি, তাঁকে তো আমি প্রতিদিন মনে মনে দর্শন করি। আর রইলো পুরীতে যাওয়া, তা যাওয়া যাবে। দশ দিনের ছুটি নিয়ে নেব। এ এমন কি বড় কথা?'

সত্তীদীনের স্ত্রী বুকে বল পেল। এমন সময় বিল্লেসুর এল। জমাদার তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বিল্লেসুর, জগন্নাথ দর্শন করতে যাবে?'

বিল্লেসুর পয়সা খরচ করতে রাজি ছিল না। সত্তীদীন বুঝতে পারে। আর সত্যিই তো, বিল্লেসুরের কাছে এমন কী-ই বা আছে! একটু ভেবে সে বলল, 'বেশ, দশদিনের ছুটি মঞ্জুর করে নে, সামনের শনিবার রওনা হব।' সত্তীদীনের সঙ্গে একজন চাকরের

দরকার ছিল।

বিল্লেসুর যখন অন্যের বদলিতে কাজ করতে শুরু করে, তখন কাছারিতে প্রতিদিন হাজিরা দেয়া জরুরী হয়ে পড়ে। গরুর কাজের জন্যে সত্তীদীনকে আর একটা চাকর রাখতে হয়। বাইরের অনেক কাজ বিল্লেসুর করে দেয়, সে এখন আলাদা থাকে. আলাদা রান্না করে খায়।

ফোকটে জগন্নাথ দর্শন করতে পারবে ভেবে, বিল্লেসুর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে ছুটি মঞ্জুর করে নিল। পরের শনিবার সে সত্তীদীনের মালপত্রের পাহারাদার হিসেবে জগন্নাথ দর্শন করার জন্যে সত্তীদীন আর তার স্ত্রীর সঙ্গে রওনা হল।

যেমন সত্তীদীনের স্ত্রীর বিশ্বাস ছিল, বাবা জগন্নাথের কৃপা দৃষ্টি পড়তে না পড়তেই সে গর্ভবতী হবে, ঠিক তেমনি বিল্লেসুরের বিশ্বাস, সত্তীদীন চাইলেই তার স্থায়ী চাকরি হবে, দেড় ইঞ্চির জায়গায় এক বিঘত ছোট হলেও হবে।

সারাটা পথ ধরে বিল্লেসুর ভাবতে লাগল, কী উপায়ে তার ইচ্ছেকে পূরণ করা যায়।

পুরীতে পৌঁছে সে খুব খুশী। এমন প্রাকৃতিক দৃশ্য সে কানপুর থেকে বর্ধমান পর্যন্ত দেখেনি। সমুদ্র-তট, বালির টিলা দেখে তার কী খুশী! সমুদ্র দেখে সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। জগন্নাথের নাম স্মরণ করে সে সমুদ্রের কিনার থেকে অনেক শামুক কুড়লো, কিছু ছোট ছোট শঙ্খও কুড়লো।

মার্কণ্ডেয়, বটকৃষ্ণ, চন্দনপুকুর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ জায়গাগুলি দেখতে লাগল। মন্দিরের চত্বরের মধ্যে ছোট ছোট আরও মন্দির আছে। প্রতিটি মন্দির সে দর্শন করতে লাগল। একটা জায়গায় একাদশীকে উল্টো করে টাঙানো দেখে সে হাসল। সত্তীদীন বলল 'বাবার প্রতাপে এখানে উল্টো করে টাঙিয়ে দিয়েছে। এখানে কেউ একাদশীর ব্রত করতে পারে না।' বিল্লেসুর একাদশীকেও করজোড়ে প্রণাম করল। তারপর সবাই মিলে কলি-র মূর্তি দেখতে গেল। কলি তার স্ত্রীকে কাঁধে বসিয়ে বাবাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সত্তীদীনের স্ত্রী ভুবনেশ্বরে যাওয়ার জন্যে তারা গোছগাছ করে নিল।

জগন্নাথের মন্দিরে এঁটোকাটার কোনো বাছবিচার নেই, অন্যের এঁটো খাওয়ার চল আছে। এখানকার লোক—যারা ছোঁয়াছুঁয়ি মানে. তারাও এখানে প্রকাশ্যে একজন আর একজনের এঁটো খায়। কেউ দোষ মনে করে না। বিল্লেসুর জমাদার এবং জমাদারনীর পাতায় এঁটো হাতে ভাত উঠিয়ে দিল। তারা কিছু বলল না, বরং খেতে খেতে হাসতে লাগল।

দিন দুই পরের কথা, জমাদার স্নান সেরে এসেছে। বিল্লেসুরও স্নান সেরে এল। স্নান সেরে সে সোজা জমাদারের কাছে গেল, সটান শুয়ে পড়ে জমাদারের পা জড়িয়ে ধরল। 'বিল্লেসুর, কি হয়েছে?—কি হয়েছে বিল্লেসুর?' জমাদার শঙ্কিত চোখে তার

দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। বিল্লেসুর করুণ কণ্ঠে বলল, 'না বাবা, কিছু না, আমাকে এ ভবসাগর থেকে উদ্ধার কর।'

'ভবসাগর থেকে উদ্ধার আমি কিভাবে করব, বিল্লেসুর? এ তোর কি হল?' সত্তীদীন বিচলিত হয়ে উঠল।

পা জড়িয়ে ধরে বিল্লেসুর বলল, 'বাবা, আমাকে গুরুমন্ত্র দাও।'

সত্তীদীন পা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'এখানে কত বড় বড় গুরু আছে, পা ছাড়, তাদের যার কাছে ইচ্ছে তার কাছ থেকে মন্ত্র নে।'

'আমার চোখে তোমার চেয়ে বড় কেউ নেই। তুমি আমায় কৃপা কর।' পা জড়িয়ে ধরেই বিল্লেসুর সত্তীদীনের পায়ে প্রণাম করল।

'আমি তো কোনো গুরুমন্ত্র জানি না। শুধু গায়ত্রী জানি।' উপায় না দেখে সত্তীদীন বলল।

'বাবা, গায়ত্রী থেকে শ্রেষ্ঠ গুরুমন্ত্র আর কিছু নেই। আমি এ মন্ত্রই নেব।'

'আরে, পৈতা নেয়ার সময়েই তো তুমি গায়ত্রী শুনেছ।'

'আমি ভুলে গিয়েছি। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি। গতকাল আমি স্বপ্ন দেখেছি, বাবা জগন্নাথ বলছেন,... কিন্তু স্বপ্নের কথা বললে, স্বপ্নের ফল পাওয়া যায় না।

স্বপ্নের কথা শুনে সত্তীদীনের স্ত্রী রোমাঞ্চিত হল। ভাবল, বিল্লেসুর বাজি মাৎ করেছে। বিল্লেসুরকে ডেকে বলল, 'বিল্লেসুর, পা ছাড়। বাবা তোকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, আমি বলছি, জমাদার গুরুমন্ত্র দেবে। এদিকে আয়, নিরিবিলিতে আমাকে স্বপ্নের কথা বলবি, চল।' কথা পেয়ে বিল্লেসুর পা ছেড়ে দিল। সত্তীদীনের স্ত্রী কুঠরীর দিকে এগুলো। বিল্লেসুর সঙ্গে গেল। কুঠরীর মধ্যে গিয়ে বলল, 'আমি ঘুমিয়ে, এমন ঘুমিয়ে, দেখলাম ভুস করে একটা আগুন জ্বলে উঠল, সেই আগুনে তিন-মুখওয়ালা একজন মানুষ বসে আছেন, তিনি বললেন, বিল্লেসুর, তুই গরীব ব্রাহ্মণ, তুই অনেক কষ্ট সহ্য করেছিস, কিন্তু তুই ঘাবড়াস না, তুই যার সঙ্গে এসেছিস তার সেবা কর, তার কাছ থেকে এখানেই গুরুমন্ত্র নে, তুই দুধের ধারায় স্নান করবি, তোর শত পুত্র হবে।' তারপর দেখি, কোথাও কিছু নেই।

সত্তীদীনের স্ত্রী ভাবল, ফল উল্টো হয়েছে। এ-স্বপ্ন আসলে তারই দেখা উচিত ছিল। কোথাও কোনো ভুলচুক হয়ে গিয়েছে। প্রতি সোমবার সে বাবার নামে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাবে বলে সংকল্প করল। তারপর সে সত্তীদীনকে মন্ত্র দেয়ার জন্যে বলল। সত্তীদীন বিল্লেসুরকে কণ্ঠি, মালা, মিষ্টি, গামছা ইত্যাদি কিনে আনতে বলল। বিল্লেসুর বাজারে গেল, মুহূর্তের মধ্যে তা কিনে আনল। সত্তীদীন বিল্লেসুরকে আবার গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করল।'

বিল্লেসুরের শ্রদ্ধামিশ্রিত চাহনির প্রভাব সত্তীদীনের স্ত্রীর ওপর পড়ল। বিল্লেসুরের জগন্নাথ দর্শনের কাছে তার জগন্নাথ দর্শন কেমন পানসে হয়ে গিয়েছে

মনে করে সে জমাদারকে বলল, 'জমাদার, আমি বলছি কি, আমিও কেন মন্ত্র নিই না!' জমাদার বলল, 'বেশ, পাণ্ডা এলে জিজ্ঞেস করব।' পাণ্ডা সত্তীদীনের স্ত্রীর দিকে তাকাল। বলল, 'এখন তুমি মন্ত্র রাখতে পারবে না। এখনও তোমার মাসিক ধর্ম হয়।'

সত্তীদীনের স্ত্রী বড় বড় চোখে তাাকিয়ে রইল। পাণ্ডা সত্তীদীনকে পরামর্শ দিল, চতুর্দশীতে গুরুমন্ত্র নিলে লাভদায়ক হয়। যতদিন পর্যন্ত মাসিক ধর্ম থাকে, ততদিন উনি মন্ত্র রক্ষা করতে পারবেন না, অসুদ্ধ থাকছেন, ফলে নানা ধরনের পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে। সত্তীদীন পাণ্ডার পরামর্শ মেনে নিল।

পুরী থেকে ওরা ভুবনেশ্বর গেল, তারপর বর্ধমানে ফিরে এল।

পাঁচ

সত্তীদীনের স্ত্রী বছরখানেক ধরে জগন্নাথের শক্তি পরখ করল। প্রতি সোমবার বাবা জগন্নাথের নামে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালায়, আর প্রতিমাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষায় বসে থাকে। কিন্তু কোনো ফল হয় না।

বিল্লেসুরের ক্রিয়াকর্ম অনেক বেড়ে গিয়েছে। তিলক মালা এবং গায়ত্রী ধারণ করার জন্যে ওর প্রখরতা দিনের পর দিন চৌকস হতে লাগল।

বছর খানেকের মধ্যে বাবা জগন্নাথের কৃপায় যখন তার কোনো ছেলেপুলে হল না, তখন সে দেবতার ওপর রুষ্ট হল, আর দিব্যশক্তির ওপর বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে মনুষ্য শক্তির ওপর সে বিশ্বস্ত হয়ে উঠল—ঠিক বস্তুবাদী লেখকদের মতো।

বিল্লেসুরের খুব গ্লানি হল। ওর গুরুমন্ত্রকে লোকে হাসি-ঠাট্টা করল। ওর জীবনেও কোনোরকম পরিবর্তন ঘটল না। সে ঠিক করল, দেশে গিয়ে থাকবে, জমিদারের গোলামীর চেয়ে গুরুর গোলামী অনেক বেশি কষ্টকর। তাছাড়া এখানকার চেয়ে দেশের জল-হওয়া ভালো, সেখানে কথা বলার এবং উপদেশ দেয়ার আপনজন আছে, এখানে সে আর থাকবে না।

গুরুমার বাস্তববাদও বিল্লেসুর আর সহ্য করতে পারছিল না। একদিন সে তার কণ্ঠী এবং মালা খুলে গুরুপত্নির সামনে রাখল। রেখে বলল, 'আমি দেশে যাওয়ার জন্যে ছুটি নিয়েছি। ফিরতেও পারি, না-ও ফিরতে পারি। বলার আর কিছু নেই। এই রইল মালা আর কণ্ঠী, এখন আমি আর চেলা নই। যেমন গুরু, তেমনি তুমি, এই রইল তোমাদের মন্ত্র।'

বলে, সে গায়ত্রীমন্ত্র আবৃত্তি করে শোনাল। পা পর্যন্ত স্পর্শ করল না। চলে গেল।

ছয়

বিল্লেসুর গ্রামে ফিরে এল। গ্যাঁটে টাকা গোঁজা, আর মুখে মিষ্টি হাসি। গাঁয়ের জমিদার, প্রতিবেশী মহাজন সবার চোখে সে বড় মাপের মানুষ হয়ে উঠল। সবাই আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগল, 'কত টাকা সে সঙ্গে করে এনেছে।' সবার মন মন্দাকিনীতে কিন্তু একটাই কথা প্রবাহিত—কীভাবে বিল্লেসুরের টাকা খসানো যায়। যে সব ছিঁচকে চোররা রাতে লাঠিতে ভর দিয়ে মাটির বাড়ির ছাদে ওঠে, উঠে আঙ্গিনায় নামে, গৃহস্থের আসবাবপত্র জামা-কাপড় চুরি করে, তারা হাত সাফাইয়ের সুযোগে রইল। একদিন মনে মনে ফন্দি এঁটে ত্রিলোচন বিল্লেসুরের সঙ্গে দেখা করল। সে তার জ্ঞানগর্ভ চোখ মেলে খুব আন্তরিকতায় বিল্লেসুরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, 'কি বিল্লেসুর, গাঁয়েই থাকা ঠিক করলে, না আবার চলে যাবে?'

ত্রিলোচন কেন, তার চোদ্দপুরুষের ইতিহাস পর্যন্ত বিল্লেসুরের কণ্ঠস্থ। শুধু হিন্দির ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের শ্রেষ্ঠ কবির মতো কোনো সম্মেলনে বা ঘরোয়া বৈঠকে সে তা আবৃত্তি করে শোনাত না। হাসতে হাসতে সে বিগলিত কণ্ঠে বলল, 'ভাই, এখন তো গাঁয়েই থাকব বলে ঠিক করেছি, —বাংলার জল-ভালো নয়।'

ত্রিলোচনের তৃতীয় নেত্র আরও জ্বলজ্বল করে উঠল। সে এক পা এগিয়ে বিল্লেসুরের আরও কাছে এল। একান্ত অনুগত ভক্তের মতো সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে বলল, 'তা বেশ, তা বেশ, কিন্তু কি কাজ করবে?'

'এখনও কিছু ভাবিনি।' বিল্লেসুর তেমনি ফিকি হেসে জবাব দিল।

'স্রোত না থাকলে কুয়োও শুকিয়ে যায়। বসে বসে কতদিন খাবে?'

'সত্যি কথাই বলছি। এখন তো এমনি এমনি দিন কেটে যাচ্ছে।'

'এ ধরনের কথা ব'ল না। গাঁয়ের লোক পাজির পাঝাড়া। পুলিসে যদি রিপোর্ট করে দেয়, তাহলে চোর-বদমাশ হিসেবে তোমার নাম লেখা হয়ে যাবে। বরং চাউর করে দাও, টাকা ফুরিয়ে গেলেই, আবার কামাই করে আনবে।'

বিল্লেসুর একটু ভয় পেয়ে গেল। বলল, 'হ্যাঁ ভাই, আজকাল যেন লোকের কাজ করতে হাত পোড়ে। সবাই বুঝবে, কিছুই যখন নেই, তখন পেট চলছে কিভাবে?—নিশ্চয়ই চুরি-চামারি করছে।'

ত্রিলোচন ভাবল, বেটা, একনম্বরের ধূর্ত। একটা কথাও পেট থেকে টেনে বের করা যাচ্ছে না। সে তাই খোলাখুলি বলল, 'হ্যাঁ দীননাথ এভাবেই দাঁত কেলিয়ে কথা বলত। চোর-বদমাশ হিসেবে এখন পুলিসের খাতায় নাম লিখিয়েছে, রাতে ওর ওপর পাহারা বসানো হয়েছে।'

তবুও সে বিল্লেসুরকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেল না। বিল্লেসুর বলল, 'পুলিসরা

চোখের দিকে চাইলেই বুঝতে পারে, কে ভালো মানুষ, আর কে খারাপ মানুষ। নিজের খেত আমি রামদীনকে ভাগে দিয়েছিলাম, সেই খেতে নিজেই চাষ-আবাদ করব।'

ত্রিলোচন যেন বিল্লেসুরকে একটু ধরতে পারল। বলল, 'এতো ভালোই ভেবেছ। কিন্তু তোমার তো বলদ নেই, কি দিয়ে হাল জুতবে?

বিল্লেসুর বেকায়দায় পড়ল। বলল, 'সেজন্যেই তো বললাম, এখনও কিচ্ছু করতে পারিনি।'

ত্রিলোচনের রাগ হচ্ছিল। গা-জ্বালা-ধরা কথা শুনে রাগ করলে ছাড়াছাড়িই হবে, তার বেশি কিছু হবে না। একথা ভেবে অনেক কষ্টে সে কটু কথা না বলে নিজেকে সংযত করল। বলল, 'আমার বলদ নাও না!'

'তাহলে তুমি কি করবে?'

'আমি আরও বড় বলদ কিনব বলে ঠিক করেছি। একশ' টাকা লাগবে কিন্তু।

বিল্লেসুরের মনে হল, একশ' টাকা বেশি নয়। বলল, 'বেশ কালকে বলব।'

একটা কাজ আছে বলে, ত্রিলোচন চলে গেল। সে মনে মনে ভাবল, এক কথায় একশ' টাকা দিতে রাজি হয়েছে, নিশ্চয়ই বিল্লেসুরের কাছে পাঁচ-সাতশ' টাকা আছে। কি কৌশলে বিল্লেসুরের কাছ থেকে টাকাগুলো হাতানো যায়, তারজন্যে ত্রিলোচন অন্যত্র পরামর্শ করার জন্যে চলে গেল।

ত্রিলোচন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিল্লেসুর ঘরের মধ্যে ঢুকল। একটু পরেই জামা পরে বেরিয়ে পড়ল। পথে যাদের সঙ্গেই দেখা হল, তারা জিজ্ঞেস করল, 'বিল্লেসুর, কোথায় চললে?' বিল্লেসুর বলল, 'আমিনের কাছে যাচ্ছি।'

সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় সবাই দেখল, তিনটে বড় বড় গাভিন বকরি নিয়ে বিল্লেসুর ফিরছে, সঙ্গে একজন লোক। সারা গ্রামে হৈ হৈ পড়ে গেল, বিল্লেসুর বকরি নিয়ে এসেছে। সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বকরির সংবাদ পেয়ে ত্রিলোচন আবার এল, বলল, 'বকরি নিয়ে এসেছ, ভালোই করেছ, অনেক বাচ্চা হবে।' বিল্লেসুর বলল, 'হ্যাঁ, বলদের কথা আর ভাবছি না, কে তাদের ছানি দেবে জল দেবে? বকরিগুলোকে পাতা ছেঁটে দেব। বলদদের বেঁধে রাখতে রাখতে নিজেই বলদ হয়ে যাব।'

'তাহলে তোমার চাষবাসের কি হবে?'

'ভাগে আছে, আধা-আধি করে নেব।'

সাত

বিল্লেসুর লম্বা সরু বাঁশের লগিতে হাঁসিয়া বেঁধে বকরিগুলোর জন্যে ডুমুর বট পাকুড় ইত্যাদির সরু সরু কচি ডাল ছাঁটার ব্যবস্থা করল। লগি ঠিক করতে করতে বেলা হয়ে গেল। বিল্লেসুর বকরিগুলোকে নিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় বের হল। পথে রামদীনের সঙ্গে দেখা। রামদীন বলল, 'ব্রাহ্মণ হয়ে বকরি পুষবে? তবে তোমার বকরিগুলো কিন্তু ভারি সুন্দর, বেশ দুধ দেবে। বছর দুয়েকের মধ্যে ছাগল-ছাগলীতে তোমার ঘর ভরে উঠবে। আমদানি ভালোই হবে।' বলে সে লোলুপ দৃষ্টিতে বকরিগুলোকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। তারপর শ্বাস বন্ধ করে চলে গেল। বিল্লেসুর মনে মনে বলল, 'প্রয়োজন পড়লে ব্রাহ্মণকেও হাল ধরতে হয়, জুতোর দোকান খুলতে হয়, তাহলে বকরি পোষা এমন কি খারাপ কাজ? ললই কুমার চাক চালাচ্ছিল, বকরি দেখে একজন কমরেড আর একজন কমরেডের সঙ্গে যেমনভাবে কথা বলে, তেমনি সে বিল্লেসুরকে উৎসাহিত করল। বিল্লেসুর ওর আন্তরিকতায় খুশী হল এবং সামনের পথ ধরে এগিয়ে চলল। সামনেই মন্দির, মন্দিরের ভেতরে মহাদেব, আর বাইরে—অর্থাৎ মন্দিরের পেছনের দিকে মহাবীরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বিল্লেসুর গুরুমন্ত্র ত্যাগ করেছে, কিন্তু বকরিগুলোকে যেন মহাবীর নেকড়ের হাত থেকে রক্ষা করেন, সেজন্যে সে মন্দিরের মধ্যে ঢুকল। মহাদেবের চাইতে মহাবীরকে তার অনেক বেশি শক্তিশালী দেবতা বলে মনে হয়। বোধ হয় মন্দিরের পেছন দিকে মহাবীর আছেন বলে। তাছাড়া এখান থেকে সদর রাস্তায় বকরিগুলোকে চরতে দেখা যায়। তাই সে মহাবীরের চরণ স্পর্শ করে মনে মনে কি যেন বলল, তারপর সে বকরিগুলোর পেছন পেছন চলল। সবুজ খেতের দিকে বকরিগুলোকে ছুটতে দেখে সে তাদের খেদিয়ে এনে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। সামনেই মন্নুর শান-বাঁধানো কুয়ো পড়ল। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে, লগি উঁচু করে রাস্তার ওপর ঝুঁকে-পড়া অশ্বত্থের কচি কচি ডালগুলো সে ছাঁটতে লাগল। ডালগুলো মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বকরিগুলো ছুটে এল। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ডাল ছেঁটে, গাছের ডালে লগিকে ঝুলিয়ে রেখে সে কুয়োর বাঁধানো চাতালের ওপর বসল। বসে বসে বকরিগুলোর ওপর নজর রাখল। সামনেই পতিত জমি। পাশ দিয়ে বর্ষার নালা বয়ে গিয়েছে। রাখাল বালকরা গরু-ছাগল নিয়ে চরাতে এসেছে, নালার কাছে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা বিল্লেসুরকে দেখল। তার বকরিগুলোর দিকে তাকালো। মনে মনে ঠিক করল, বিল্লেসুরের বকরিগুলোকে লোপাট করলে মন্দ হয় না। ধূর্ত ছেলেগুলো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল, বকরিগুলোকে খেদিয়ে নালার মধ্যে নিয়ে যাবে। বিল্লেসুর উতলা হবে—বকরিগুলোকে খুঁজবে। খুঁজে পেলে পাবে, না পেলে না পাবে। একজন বলল, ডোমকে খবর দেয়া যাক, নালার মধ্যে বকরিকে মারবে, আমরাও কিছু মাংস পাব। আর একজন বলল,

গাভিন বকরি, এ-মাংস দিয়ে কি হবে। কিন্তু বকরিগুলোকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোভ তারা সামলাতে পারল না। পরামর্শ করে কয়েকজন দূরে দূরে রইল, আর কয়েকজন বিল্লেসুরের কাছে এল। একজন বলল, 'কাকা, এসো না, আমরা খেলা করি।' বিল্লেসুর মুচকি হাসল, ' তোদের বাপকে ডেকে আন, তার সঙ্গে খেলা করব, তোদের সঙ্গে কি খেলব?' বলে সে সতর্ক দৃষ্টিতে বকরিগুলোকে দেখতে লাগল। আর একজন বলল, 'তা বেশ কাকা, না খেল না খেলবে, বিদেশে তো গিয়েছিলে, সেখানকার গল্প বল।' বিল্লেসুর বলল, 'মানুষ মরলে স্বর্গে যায়, তখন স্বর্গ দেখে। বড় হয়ে বিদেশে গেলে তখন বুঝতে পারবি, বিদেশ কেমন।' তৃতীয় জন বলল, 'এখানে আমরা আছি, নেকড়ের কোনো ভয় নেই। ঐ উঁচু জমিতে যে বাগিচা আছে, সেখানে নেকড়ে আসে।' বিল্লেসুর বলল, 'এদিকেও নেকড়ে আসে, সে নেকড়ে অবশ্য মানুষের বেশ ধরে আসে।'

বলে বিল্লেসুর উঠে দাঁড়াল। বকরিগুলো সমস্ত পাতাগুলো খেয়ে সাবাড় করেছিল। ঝট করে এগিয়ে গিয়ে সে লগি তুলে নিল। আর বকরিগুলোকে হাঁক দিয়ে ডেকে অন্যদিকে রওনা হল। পতিত জমির ওপর যে উঁচু বাাগিচা আছে, সেদিকে যাওয়ার সময় সে রিয়াঁর কচি কচি ডাল শুদ্ধ পাতা ছাঁটল। দীননাথ গ্রামে ফিরছিল। পথে তার সঙ্গে দেখা হল। লোলুপ দৃষ্টিতে বকরিগুলোর দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কতো দিয়ে কিনেছ?' বিল্লেসুর ওর মতলব বোঝার চেষ্টা করল। বলল, 'আধাআধি ভাগে পেয়েছি।' ভাগে পেয়েছে জেনে দীননাথের টিকি খাড়া হয়ে গেল। সে ভীষণ অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, 'তিনটেই?' বিল্লেসুর তার বিশেষ ধবনের মুচকি হাসি হেসে জবাব দিল, 'তা নয় তো কি,—একটা?' দীনা হকচকিয়ে গেল। তাই আবার জিজ্ঞেস করল, 'মানে বকরি তোমার, দুধ তোমার, মরে গেলে ওর গেল, বাচ্চা হলে অর্ধেক তোমার, অর্ধেক ওর?' বিল্লেসুর বলল, 'হ্যাঁ।'

বিল্লেসুরের স্বপ্নাতীত লাভের যে ভারি বোঝা, সে বোঝায় দীনার কোমর বেঁকে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, গোঁসাই যাকে দেন, এমনিভাবেই দেন।' মনে মনে দীনার ঈর্ষা হল। বিল্লেসুর একাই মজা লুটবে? আমি যদি ওর ছাগলকে না খাই, তবে আমি দীননাথই নই।

বিল্লেস্বুর দেখল, দীননাথের কপাল কুঁচকে গিয়েছে। ও কি ভাবছে, ওর চোখ দেখেই বিল্লেসুর আঁচ করতে পারল। বিল্লেসুর জীবনের পথে প্রতিদিনই এমনিভাবে হোঁচট খাচ্ছিল, কখনও সে হোঁচট থেকে বেঁচেছে, কখনও বা আঘাত খেয়েছে। এখন সে অনেক কিছু সামাল দিতে পারছে, তার দৃষ্টি সব সময় সামনের দিকে প্রসারিত। হঁটতে হাঁটতে সে ডুমুর গাছের নিচে এল। কিছু পাতা ছাঁটল, তারপর তা আঁটি করে বাঁধল। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বকরিগুলোকে দেবে। বকরিগুলের পেট এখন ভরা, তাই সে পাতার আঁটি মাথায় নিয়ে অন্য পথ ধরে বাড়ি ফিরল।

আট

বিল্লেসুরের নিজের বাড়ি ভাগবাঁটোয়ারা হওয়ার জন্যে এত টুকরো হয়েছিল যে, বকরিগুলোকে নিয়ে সেখানে থাকা অসম্ভব ছিল না। ভাইদের কারো রাজরোগ নেই, তারা বকরির গায়ের বোটকা গন্ধ সহ্য করবে কেন। তাছাড়া বাড়িও পুরনো হয়ে গিয়েছিল, অনেকগুলো ঘর ভেঙে পড়েছিল। আর রাতে নেকড়ের রূপ ধরে চোরও আসতে পারে, বকরি চুরি করতে পারে। এসব নানা কারণের জন্যে বিল্লেসুর গ্রামের একটা খালি পড়ে-থাকা পুরনো বাড়ি বসবাসের জন্যে নিল। কিনল না, শর্ত হল, সে সেই বাড়ি ছেয়ে নেবে, লেপা-পোঁছা করবে, বাড়ি যাতে না-পড়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। নোটিশ দিলে ছ'মাসের মধ্যে বাড়ি খালি করে দেবে। বাড়ির মালিক বিভূঁইয়ে থাকে, বলা যেতে পারে সে সেখানেই থাকবে। যার জিম্মায় বাড়ি ছিল, সে বিল্লেসুরের কাছ থেকে ষোল আনা সেলামি নিয়ে বিল্লেসুরকে কৃতার্থ করল।

এ বাড়ি পরদেশীর, সেজন্যে ভয়ের কোনো কারণ ছিল, তা নয়। পরদেশী যখন এ বাড়িতে থাকত, তখন সে বিল্লেসুরের মতো গাঁয়েরই মানুষ ছিল। দেশে অভাব-অনটন লেগেই আছে, সেজন্যে সে পরদেশে গিয়েছে। বাড়ির সামনে একটা এঁদো কুয়ো আর তেঁতুল গাছ আছে। বর্ষার জল পড়ে পড়ে বাড়ির দেয়াল এবড়ো খেবড়ো হয়ে গিয়েছে। যেন দেয়ালগুলো বেয়ে পয়নালা নেমেছে। ভেতরে পয়নালার মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্ষার জল বৈঠকখানার চৌকাঠের নিচে দহ করে বয়ে গিয়েছে। দহ বড় হতে হতে এমন বিশাল হয়েছে যে, বড় বড় জানোয়ার—যেমন কুকুর ইত্যাদি অনায়াসে তার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। বৈঠকখানার মেঝে কোথাও সমতল নেই, সেখানে শোয়ার তো কোনো কথাই ওঠে না, খাটিয়া পাতাও সম্ভব নয়। অন্যদিকে একটা দালান আছে, আর সেই দালানের লাগোয়া একটা ছোট্ট ঘর । সেই ঘরে বিল্লেসুর উঠল। দরজার সামনে যে গর্ত, সেই গর্ত মাটি দিয়ে ভরাট করে লেপে দিল। বাদ বাকি ঘর সে ধীরে ধীরে মেরামত করতে লাগল।

একবেলা সে রুটি বানায়, আর সে রুটি দু'বেলায় খায়। এ-ভাবে সে বছর খানেকের বেশি কষ্টেসৃষ্টে কাটাল। ওর লক্ষ্য এবং কাজ বাড়তে লাগল। কিন্তু বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারল না। গ্রামে যত মানুষ আছে, তারা কেউ-ই তার আপনজন নয়। সে যেন শত্রুর কেল্লার মধ্যে বাস করছে। ভাইরাও আপন নয়। বিল্লেসুর ভাবে, কেন একজন আর একজনের পাশে দাঁড়ায় না। কোনোদিন সে এর উত্তর খুঁজে পায়নি। কিন্তু পৃথিবীর আসল উদ্দেশ্য কি তা সে জেনেছে। তা-ই জান কবুল করে কাজ করতে হয়, অন্যকে মদত করতে হয়, সহযোগিতা নিতে হয়—এ-ই হচ্ছে সত্য। এদিকে কেউ তাকায় না, সেজন্যে সে দুর্বলতা অনুভব করে। কারও

মুখও দেখা যায় না। আমাদের এই সক্রেটিসের কণ্ঠে কোনো ভাষা ছিল না, কিন্তু তাই বলে তার ফিলোসফি দুর্বল ছিল, তা নয়। শুধু তার কথা কেউ কানে তুলত না। সে নিজেও গোলক ধাঁধা থেকে বেরুনোর কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, সেজন্যে সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

আরও কিছুদিন এভাবে কেটে গেল। বকরিগুলোর সাথে সে থাকে। সমস্ত ঘরে বকরির নাদি। অনেকদিন ধরে বকরিদের সঙ্গে থাকতে থাকতে সে বকরির মতো হয়ে গিয়েছিল। যে বকরিগুলোকে সে কিনে এনেছিল, সেগুলোর নাতিপুতি হয়ে গিয়েছে। কিছু পাঁঠা সে বিক্রিও করেছে। হাতে টাকা-পয়সা ভালোই আসছিল। গাঁয়ের মানুষের চোখ টাটাচ্ছিল। একবার গ্রামের কিছু লোক জমিদারের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে হাজির হয়, গ্রামের সমস্ত গাছের ডাল ছেঁটে বিল্লেসুর সাফ করে দিয়েছে, ওর বকরিগুলোকে তিনি যেন বিক্রি করিয়ে দেন। জমিদার 'ঠিক আছে' বলে ওদের উৎসাহিত করলেন, কিন্তু ওদের নালিশে কান দিলেন না। কারণ বিল্লেসুরের বকরির ওপর তার নজর আগেই পড়েছিল, আর সরকারি গাছ সাফ করার নজরানা তিনি বিল্লেসুরের কাছ থেকে অন্যভাবে উসুল করে নিয়েছিলেন। বিল্লেসুরকে 'বোকরিহা' বলে ডেকে গ্রামের লোক তাদের মনের ঝাল মেটাচ্ছিল। আর তার উত্তরে বিল্লেসুর বকরির বাচ্চাদের নাম রাখল গ্রামের মানুষদের নামে।

নয়

স্নান-টান সেরে, খাবার তৈরি করে, খেয়ে দেয়ে, রাতের জন্যে খাবার তুলে রেখে বিল্লেসুর বকরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কাঁধে সেই লগি। জাম পেকে গিয়েছে। একটা ডালে লগি লাগিয়ে হেঁচকা টান দিল। লগির একদিকে হাঁসিয়া বাঁধা, অন্যদিকে আর্শি করা। জামের গোছা পড়ল। জাম ছিঁড়ে ছিঁড়ে গামছায় নিল, আর খেতে খেতে বড় রাস্তা ধরে চলল। সামনেই মহাবীরের মন্দির। সে মন্দিরের চাতালে উঠল, উঠে চাতালের ওপর থেকে জামের বিচি উগলে উগলে নিচে ফেলতে লাগল। সে মহাবীরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল এবং প্রতিদিনের মতো আজকেও বলল, 'আমার বকরিদের ওপর নজর রেখ'। তুলসীদাস বা সীতার মতো বিল্লেসুরের অন্তর্দৃষ্টি ছিল না, থাকলে সে দেখত, মহাবীরের মূর্তি মুচকি হাসছে। খুব দ্রুত মহাবীরকে প্রণাম করে সে মন্দিরের চাতাল থেকে নিচে নামল। বকরিগুলোকে নিয়ে বড় রাস্তা ধরে বাগিচার দিকে চলল। তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। মাটি কাদা কাদা হয়ে গিয়েছে। পুকুর ডোবা জলে টইটুম্বর। তুলো, ধান, অগমন, জোয়ার-বজরা অড়হড়, সন সনই, বরবটি, কাঁকুড়-শসা, ভুট্টা, বিউলি

ইত্যাদি চাষ-আবাদ করার জন্যে চাষীরা দ্রুত হাল চালাচ্ছিল। চাষীদের কী ভাবনা-চিন্তা তা বিল্লেসুর জানত। একজন খাঁটি চাষী হওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে সে প্রথম বর্ষার মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ বুক ভরে টানতে টানতে বকরি নিয়ে হাঁটছিল। যে খেতগুলো সে ভাগ-চাষে দিয়েছে, তার থেকে একটা খেত সে নিজেই চাষ করবে বলে নিয়েছে। বর্ষার সময় চাষীদের বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। এক হাত পর পর বীজ ছড়িয়ে দিলেই হল। বর্ষার জলে খেত সুজলা-সুফলা হয়ে ওঠে। তার নিজের বলদ নেই, অগমনের চাষ করার জন্যে কারও কাছে বলদ চাইলেও ধার দেবে না। বিল্লেসুর ঠিক করল, ছ-সাতদিনের মধ্যে সে কোদাল চালিয়ে যতটুকু প্রয়োজন, ততোটুকু খেত বানিয়ে নেবে। গ্রামের লোক চাষ-আবাদ করে ঠিকই, কিন্তু মিষ্টি আলুর চাষ করে না। মিষ্টি আলু থেকে বেশ লাভ হয়। আর অঘ্রান মাসে সেই খেতে মটরের চাষ করবে। মিষ্টি আলুর গাছ লকলকিয়ে উঠলে, রাতে পাহারা দিতে হবে। তখন না হয় কাউকে কিছু দিয়ে রাতে পাহারার ব্যবস্থা করা যাবে। অনেক টাকা হাতে আসবে।

ভাবতে ভাবতে বিল্লেসুর যখন এই দুনিয়াতে ফিরে এল, তখন দেখল, সে অনেকটা পথ চলে এসেছে। ব্যাকুল এবং উত্তেজনায় সে বকরিগুলোকে পরখ করতে লাগল— গঙ্গা, যমুনা, সরযু, পারবতী, সেখাইন, জমীল, গুলবিয়া সিতারিয়া—তোরা আছিস? রমুয়া, শামুয়া, ভগবতিয়া, পরভুয়া—আছিস, টুরূই... দিনবা? বিল্লেসুর চমকে উঠল, চারদিকে তাকাল— পেছনে যতদূর চোখ যায় দেখতে লাগল। কিন্তু দীননাথকে দেখা গেল না। বুক ধক্ করে উঠল। দীননাথ সবচেয়ে তাগড়া। সে-ই পেছনে পড়ে রইল—কোথায় গেল! সে ডাকতে লাগল... 'উ র র র, উ র র র র্। দিনবা আয়, আয়, উ র র র্। দিনবা আয়... আয়! উ র র র্ উ র র র্, বাবা দীননাথ, উ র র র্!' টুরূই ভ্যা ভ্যা করতে লাগল। দীননাথের পায়ের শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না 'টুরূই, দিনবা কোথায় রে?' টুরূই ভ্যা ভ্যা করতে করতে বিল্লেসুরের কাছে এল। বিল্লেসুর যে রাস্তা ধরে বকরিদের নিয়ে এসেছিল, সেই রাস্তা ধরে ফিরে চলল। সেই নালার কাছে ছেলেরা গরু-ছাগল চরাচ্ছিল। বিল্লেসুরকে দেখে তারা মুচকি হাসল। বিল্লেসুরের বুকের ভেতর ডুকরে কেঁদে উঠল। ওদের মুচকি হাসি দেখে ওর মাথায় রক্ত সরাৎ করে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'বাবারা, আমার বকরি কি দেখেছ?'

'কোন্ বকরি?'

'একটা পাঁঠা, আমি দিনবা বলে ডাকি।'

দিনবা বলে যাকে ডাক, সেই দিনবাকে জিজ্ঞেস কর, আমি জানি না তোমার দিনবা কোথায় আছে।'

বিল্লেসুর আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করল না। ওর সন্দেহ হল। মন চাইল, নালার

কাছে গিয়ে খোঁজে, কিন্তু বকরি কার ভরসায় ছেড়ে যাবে, যদি আর একটা বাচ্চা গায়েব করে দেয়, তখন কি করবে? সে দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা হল। বাচ্চা আর বকরিগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে চলল। পথে দু'-একজনের সঙ্গে দেখা হল, তারা জিজ্ঞেস করল, 'বিল্লেসুর, ব্যাপার কি, বকরিগুলোকে এমনিভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন?' বিল্লেসুর বলল, 'ভাই, একটা পাঁঠা কে যেন ধরেছে, ঐদিকে নালার কাছে যে ছোকরারা গরু চরাচ্ছে, তারা বলছে না।' যারা শুনল তারা বলল, 'হ্যাঁ, গ্রামে চোরের এমন উৎপাত হয়েছে যে কি বলব, উঠোনে যদি কাঠের বাসন-কোসন থাকে, ছাদ দিয়ে নেমে তা চুরি করে। বললে আবার বেজ্জতি করে। গাঁ ছেড়ে কোথায় পালাই, বল?' বিল্লেসুর এগিয়ে চলল। দরজা খুলল। কুঠরির মধ্যে বাচ্চাগুলোকে, আর বৈঠকখানায় বকরিগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা লাগাল। তারপর পান্টি নিয়ে দীনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমে দীনার বাড়ি গেল। গিয়ে জানল দীনা বাড়ি নেই। সেখান থেকে সোজা শুকনো পথ ধরে নালার দিকে গেল। উঁচু টিলার ওপর একটা ছেলে বসেছিল, সে চারদিকে চুলবুল করে তাকাচ্ছিল। বিল্লেসুর বুঝতে পারল। নালার ধার ধরে ধরে সে এগুতে লাগল। ছেলেটি এক বিশেষ ধরনের আওয়াজ করে জানান দিল। বিল্লেসুর বুঝতে পারল, আসেপাশেই কোথাও আছে। সে এগিয়ে চলল। একটু দূরেই একটা ঝোপ চোখে পড়ল, নিশ্চয়ই এখানে কোথাও বকরিটাকে মেরেছে। ঝোপের কাছে গেল, সেখানে কাউকে দেখতে পেল না। ঝোপের মধ্যে ঢুকল। আতিপাতি খুঁজতে লাগল। মাটি রক্তে ভেজা। সে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। পাঁঠা বা মানুষ কাউকেই দেখল না। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। মন কেঁদে উঠল, কিন্তু চোখে এক ফোঁটাও জল ছিল না। কোথাও কোনো ন্যায় নেই, মানুষ শুধু উপদেশ দেয়। হাঁটতে হাঁটতে সে কুয়োর কাছে এল। খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কুয়োর শানবাঁধানো চত্তরে বসল। পাঁঠাটাকে জবাই করেছে। ছেলেটি জানে কিন্তু বলছে না। আট টাকা দাম। মন কেঁদে উঠল। কিন্তু কেউ তার পাশে দাঁড়াবে না। সূর্য ঢলে পড়েছে, বিকেলের পড়ন্ত রোদ তার মাথার ওপর এসে পড়েছে, কিন্তু বিল্লেসুর চিন্তায় এমন ডুবে ছিল যে, কোনো গরমই সে অনুভব করল না।

এখন বকরিগুলোর খিদে পেয়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, বকরিগুলোকে এখন চরানোর আর সময় নেই। লগি নেই বলে পাতা ছাঁটাও সম্ভব নয়, রাতে না খেয়ে কাটাবে। ওরা কিভাবে সারাটা রাত কাটাবে? না খেলে সকালে দুধ দেবে না। বাচ্চাগুলো না খেয়ে থাকবে। খিদেয় কাহিল হয়ে পড়বে। অসুস্থ হয়েও পড়তে পারে। ঘরে কিছুটা ভূষি আছে, কিন্তু অতগুলো বকরি আর বাচ্চাদের তা দিয়ে কি হবে? রাতে গাছের ডাল ছাঁটতে হবে।

সূর্য অস্ত গিয়েছে। বিল্লেসুরের চোখে সন্ধ্যার উদাস ছায়া নেমে এসেছে। শোঁ শোঁ হাওয়া বইছে। নালা তরতর করে বয়ে যাচ্ছে, যেন মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে ছুটছে।

লোকে খেতের কাজ সেরে মন্থর পায়ে বাড়ি ফিরছে, বাড়িতে নয়, যেন কড়িবর্গার নিচে চাপা পড়ে মরার জন্যে ফিরছে। পাখীরা তাদের বাসার সামনে ডালে বসে কিচিরমিচির করছে—চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, রাতে তাদের বাড়িতে বনবেড়াল এলে কে তাদের রক্ষা করবে? বাতাস বয়ে যাচ্ছে, আর যেন আভাসে-ইঙ্গিতে জানাচ্ছে সব কিছুই ঠিক এমনিভাবেই বয়ে যায়।

বিল্লেসুর পান্টি হাতে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে ফিরছিল। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল—বুক বাঁধছিল। অন্য কাজের জন্যে নিজের মনের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। আশা-ভরসা জাগছিল। গ্রামের সীমানার কাছে এল। মহাবীরের মন্দিরের দিকে চোখ পড়ল। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সামনের দিক দিয়ে মহাবীরের মন্দিরের চত্বরে উঠল। চত্বর দিয়ে দিয়ে মন্দিরকে উল্টো পথে প্রদক্ষিণ করল, তারপর পেছনের দিকে মহাবীরের কাছে গেল। কোমরে দু'হাত রেখে সটান দাঁড়াল, আবেগময় কণ্ঠে মহাবীরকে বলল, 'দেখ, আমি গরীব মানুষ। তোকে সবাই গরীবের রক্ষক বলে, আমি সেজন্যে তোর কাছে আসতাম। তোকে বলতাম, আমার বকরি আর বাচ্চাগুলোকে দেখিস। তুই এ কী নজর রাখলি! বল, এই ভোঁতা মুখ নিয়ে কেন দাঁড়িয়ে আছিস?' মহাবীরের কাছ থেকে সে কোনো জবাব পেল না। বিল্লেসুর মহাবীরের চোখে চোখ রাখল, তারপর পান্টি দিয়ে মহাবীরের মুখের ওপর এক ঘা মারল। মহাবীরের মাটির মুখ ডাং-গুলির মতো ছিটকে খানিক দূরে গিয়ে পড়ল।

দশ

বিল্লেসুর সম্পর্কে যা লিখছিলাম, দুঃখের মুখ দেখতে দেখতে দুঃখের যে-ভয়ঙ্কর রূপ, সেই রূপকে সে বার বার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। কখনও নতিস্বীকার করেনি। মহাত্মা গান্ধী বকরির দুধ পান করছেন, সেজন্যে সম্প্রতি শহরে বকরির দুধ দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, দুষ্প্রাপ্য হওয়ার জন্যে গরুর দুধের চাইতে বকরির দুধের চল অনেক বেড়েছে। কিন্তু বিল্লেসুরের সময়ে সারা দুনিয়া বকরির দুধকে ঘৃণার চোখে দেখত। কেউ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে, যার গরুর দুধ খাওয়া বারণ, তার জন্যে বকরির দুধের নিদেন দেয়া হত। বিল্লেসুরের গ্রামে তেমন একজনও রুগী ছিল না। ফলে বকরির দুধ গ্রামে বিক্রি হত না, কারও কৃপাপাত্র হওয়ার জন্যে বকরির দুধ দিলে মুখ বেঁকাতো। তাই সে খোয়া-ক্ষীর বানাতে লাগল। বকরির দুধ দিয়ে খোয়া বানানোর প্রথম প্রতিবন্ধক হল স্বয়ং প্রকৃতি। বকরির দুধে জলের ভাগ বেশি থাকে, বড় বড় চেলা-কাঠ জ্বালাতে হয়, অনেকক্ষণ ধরে উনুনের ধারে বসে থাকতে হয়, আর এতক্ষণ জ্বাল দেয়ার পর ছোট্ট একটা খোয়ার গোলা বের হয়। তখন মন এতটুকু

হয়ে যায়। মোষের দুধ এত জ্বাল দিলে এক সের দুধে এক পোয়ার মতো খোয়া পাওয়া যায়। এ তার অর্ধেকেরও কম। ধৈর্য ধরে সে খোয়া বানিয়ে জোতপুরের ভজনা হালুইকারের কাছে বিক্রি করতে গেল। সে তখন কদমা তৈরি করছিল, তাড়াহুড়োর জন্যে সে খোয়া পরখ করল না, রেখে দাম দিল। পরের দিন খোয়া নিয়ে গেলে সে খোয়া রেখে দিল। বিল্লেসুর বলল, 'দাম?' সে বলল, 'দাম তো গতকালই তোমাকে দিয়েছি, ভেবেছিলাম, মোষের দুধের খোয়া,—ছিল বকরির দুধের। বকরির দুধের খোয়ার দাম অর্ধেকের চেয়ে কম, আমি বকরির দুধের খোয়া নিই না। আর এনো না, সমস্ত মিষ্টি নষ্ট হয়ে যায়, খরিদ্দার গালমন্দ করে। এতে না আছে ঘি, না আছে কোনো স্বাদ। এর থেকে সামান্য যেটুকু ঘি বের হয়, তা অন্য ঘিয়ের সঙ্গে মেশানো যায় না। সমস্ত ঘি থেকে দুর্গন্ধ বের হয়।' বিল্লেসুর মাথা নিচু করে নিঃশব্দে চলে এল। মাল আছে, অথচ তা বিক্রি হয় না। সে একটা উপায় বের করল। খোয়া তৈরির চেয়ে পরিশ্রম অনেক কম। ঘুটের আগুন জ্বালিয়ে তার ওপর হাড়ি ভর্তি দুধ বসিয়ে দিতে লাগল। বসিয়ে নিজের কাজকর্ম সারত। দুধ ফোটার পর ঠাণ্ডা করে জমিয়ে দিত, পরের দিন তা থেকে মাখন বের করত। ঘোল নিজে খেত, ছাগলের বাচ্চাদের খাওয়াত। মাখন থেকে ঘি বের করে তাতে চার ভাগের একভাগ মোষের ঘি মিশিয়ে দিত, আর ছটাক আধ-পোয়ার মতো যা বেরুত, তা সস্তায় বাজারে গিয়ে বিক্রি করে আসত। গ্রামে গরু মোষ এবং বকরির একসঙ্গে মেশানো ঘি বিক্রি হয়। যাদের কাছে দু-তিন রকমের জন্তু জানোয়ার আছে, তারা দুধ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জমায় না। বিল্লেসুরের ব্যবসা চলছিল। বকরি মারা গিয়েছিল, তাই সে লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যুর ফিলসফিতে পরিবর্তন সাধিত করে নিজের ভবিষ্যতের ওপর দৃষ্টি দিল। ঠিক করল, বকরিগুলোকে সে আর বাগিচায় চরাতে নিয়ে যাবে না। যতদিন খেত তৈরি না হচ্ছে, মিষ্টিআলুর চারা যতদিন না বেরুচ্ছে, ততদিন সে বড়িতেই তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। ভোর হতে না হতেই বিল্লেসুর কোদাল নিয়ে খেতের কাজে লেগে যেত। রাতে এত পাতা ছেঁটে এনেছিল যে, সারা দিন খেয়েও শেষ করতে পারবে না। বকরি এবং বাচ্চাগুলো আগের মতোই ঘরে এবং বৈঠকখানায় বন্ধ থকত। কোদাল দিয়ে বিল্লেসুরকে খেত কোপাতে দেখে গাঁয়ের লোকজন তাকে নিয়ে মশকরা করল। কিন্তু বিল্লেসুর ওদের কোনো জবাব দিল না, নিজের কাজেই মগ্ন রইল। দুপুরের আগেই সে অনেকখানি জায়গা কুপিয়ে তৈরি করল। দেখে তার বুক ভরে উঠল। ভরসা হল, আর ছ'-সাতদিনের মধ্যেই হারিয়ে যাওয়া বকরির লোকসান পুষিয়ে নেবে। দুপুরের আগেই সে বাড়ি ফিরে এল। স্নান সেরে লপসি বানাল, খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করল। দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল, তৃতীয় প্রহর শেষ হওয়ার আগে সে উঠল, উঠে আবার খেত কোপাতে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত খেতে কাজ করল, বকরিগুলোর জন্যে পাতা ছেঁটে রাত করে বাড়ি ফিরল। সাতদিনের জায়গায় পাঁচ দিনে খেতের একটা অংশ তৈরি করে

ফেলল। পুরো খেতটার মধ্যে সে দু'টো অংশ তৈরি করল। লোকে জিজ্ঞেস করল, 'বিল্লেসুর, কি বুনবে বলে ঠিক করেছ?' বিল্লেসুর বলল, 'ভাঙ বুনব।' গ্রামে কেউ কাউকে মনের কথা খুলে বলে না—গ্রামে কেন, কোথাও বলে না। বিল্লেসুর খোঁজখবর করে মিষ্টিআলুর বিছন নিয়ে এল। একদিন লোকে দেখল, বিল্লেসুর মিষ্টিআলুর বিছন লাগাচ্ছে। বর্ষা হওয়ায়, মিষ্টিআলুর অঙ্কুর বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে সে আলগোছা মাটি চাপা দিতে লাগল।

এগারো

ত্রিলোচনের বলদ না নিয়ে বিল্লেসুর যখন বকরি কিনল তখন থেকেই এই গোবেচারাকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে ত্রিলোচন প্যাঁচ কষতে লাগল। বকরির বাচ্চাগুলো বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে ধনী মানুষ বলে তার নামডাক শুরু হয়ে গেল। লোকে নানা ধরনের মন্তব্য করতে লাগল। আশ্বিন মাস, বিল্লেসুরের মিষ্টিআলুর গাছ লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে, লোকে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল, কতো মণ মিষ্টিআলু সে পাবে। বিল্লেসুর ঘরে বসে বকরির দুধে ছাতু-গুড় মেখে খাচ্ছিল। এমন সময় ত্রিলোচনের আবির্ভাব হল। বকরির একটা বাচ্চা উল্টো করা একটা ঝাঁকার নিচে রাখা ছিল। সেই ঝাঁকার ওপর ত্রিলোচন বসার জন্যে ঘুরল। বিল্লেসুরের হাত নাড়ানো দেখে সে মাটিতে বসল। 'বিল্লেসুর, একটা ভালো খবর আছে' —বলে বিল্লেসুরের দিকে তাকিয়ে ত্রিলোচন হাসল। উপদেশের ভঙ্গিতে হাতের মুদ্রা করে, কোনো কথা না বলে, তাকে আশ্বস্ত করে বিল্লেসুর বোঝাল, 'একটু ধৈর্য ধর।' ত্রিলোচন জিজ্ঞেস করল, 'খাওয়ার সময় কথা বল না, নাকি?' গম্ভীরভাবে চোখ বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে বিল্লেসুর জবাব দিল। ত্রিলোচন এখন কি নিয়ে আলোচনা করতে পারে, তা মনে মনে ভাবতে লাগল।

তাড়াতাড়ি ছাতু খেয়ে বিল্লেসুর উঠল। নর্দমার পাশে হাত ধু'ল, কুলকুচি করল, অভ্যেস বসতঃ পৈতায় বাধা তামার দাঁত-খোঁচানী দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল। তারপর আবার কুলকুচি করল, ঢেকুর তুলে মাথা নিচু করে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ত্রিলোচন তারদিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। বিল্লেসুর একটা খাটিয়া বাইরে বের করে পাতল। পেতে বলল, 'এস, একটু সামলে বস, নড়াবে না।' ত্রিলোচন উঠে খাটিয়ায় বসল। বিল্লেসুর খাটিয়ার একদিকে বসল।

ত্রিলোচন বিল্লেসুরের দিকে তাকাল, তারপর বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে বলল, 'বিল্লেসুর, একটা ভালো পাত্রী আছে, চাও তো কথা বলি।'

বিয়ের কথা শুনে বিল্লেসুরের রক্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিন্তু হিন্দু ধর্মানুযায়ী

সে বিয়ের উপযোগিতাবাদে চলে এল, 'দেখলেই তো ছাতু খাই, ঘরে কোনো মেয়ে মানুষ থাকলে, মরতে বসেও রুটি সেঁকে দিত।'

ত্রিলোচন গম্ভীরভাব বজায় রেখে বলল, 'হ্যাঁ, যথার্থ বলেছ।'

বিল্লেসুর উৎসাহিত বোধ করল। বলল, 'গাঁয়ের ভাই-বন্ধুদের প্রতি মোহ আছে। তাই এখানে পড়ে আছি, তা না হলে দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে মরার জন্যে আমার জায়গা আছে।'

—'এ কথা আবার বলতে হয়?'

বিল্লেসুরের পৌরুষ জেগে উঠল। সে বলল, 'বাংলায় গিয়েছিলাম, চাইলে সেখানে ঘর বসাতে পারতাম। কিন্তু বাপ-ঠাকুর্দার নামও রাখতে হবে! তাই ভাবলাম, কেন নাক কাটাব? তখন তোমরাই বলতে, বিল্লেসুর বাপের নাম ডুবিয়েছে।' বিল্লেসুর যে ভূমিকা দিয়ে শুরু করেছিল, সেখান থেকে আসল বিষয়বস্তুতে ফিরে আসতে পারছিল না। আসার জন্যে এগিয়েও, আবার পিছিয়ে গেল। ত্রিলোচন বলল, 'সারা গ্রাম তোমার তারিফ করে, শুধু গ্রামই নয়, অন্য গ্রামের লোকও বলে, বিল্লেসুর মরদের মতো মরদ।''

বিল্লেসুর বলল, 'নাম-ডাক কে না চায়? এত পরিশ্রম আমি কেন করছি? নাম-ই যদি না হয়, তবে আর কিই বা রইল। আমার বাবা মারা গিয়েছেন, কিন্তু তিনি তো আমার মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। ছেলেপিলে যদি না হয়, তবে সে নাম কে উজ্জ্বল করবে?'

ত্রিলোচন বলল, 'তাও তো বটে। তোমার মতো চালাক-চতুর লোকের বাবার কোনো নাম থাকবে না, এ-কেমন কথা!' বলেই সে গম্ভীর হল।

বিল্লেসুর বলল, 'পিতা-মাতা হচ্ছেন বিশ্বসংসারের দেবতা। মা-বাবা যদি না থাকতেন, তবে ধর্মই থাকত না।'

ত্রিলোচন বলল, 'ধর্মকে রক্ষা করা সবার অবশ্য উচিত। আর, সেজন্যই তো ধর্মের জন্যে প্রাণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে'।

'এই মাত্রই তো দেখলে, খেতে কাজ করতে গিয়েছিলাম, ঘরে ফিরলাম, ঘরে মেয়ে মানুষ নেই, মেয়েমানুষ ছাড়া বিধিসম্মত রান্নাবান্না হয় না, তাড়াহুড়োর জন্যে স্নান করা হয় না, স্নান না করে রুটি বানানো ঠিক নয়, ভোজন করাও নয়। বল, ধম কোথায় থাকছে?' বিল্লেসুর উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'আমি তো অনেক আগেই বুঝেছি, এখন তুমিই বোঝ।' বলে ত্রিলোচন তৃতীয় নয়নের ওপর মনকে স্থাপন করল।

বিল্লেসুর আর একবার ত্রিলোচনকে দেখল, মনে মনে ভাবল, দেখেছ, কেমন দালাল হয়ে এসেছে। ভাবছে, দুনিয়ায় ওই একমাত্র চালাক। এখুনি এখুনি হয়তো টাকার কথা তুলবে। জানি না, কার মেয়ে—মেয়েটিই বা কে? নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দোষ আছে। অসুবিধা হচ্ছে, নিজেরই চলে না। খিদে পেলে খেতে হয়, বৃষ্টি

হলে, রোদ্দুর উঠলে, লু বইলে, ঘরের মধ্যে থাকতে হয়। বাড়ি-ঘর দেখাশোনার জন্যে বিয়ে-থা করা দরকার। বাড়ির কাজকর্ম ঘরের বৌ এসে সামলায়। মানুষ নানা ধরনের জিনিসপত্র দিয়ে ঘর ভর্তি করে, বৌয়ের জন্যে গয়নাগাটি বানায়। এ-সব হচ্ছে ঢোল—ঢোলের মধ্যে ফাঁপা। গুরুপত্নীর কথা বিল্লেসুরের মনে পড়ল, গ্রামের ঘরে ঘরে শোনা-ইতিহাস তার চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠল। এখন অব্দি ও যা কিছু বলেছে, মিথ্যে বলেছে। কারণ বুলবুলি ফাঁদে আটকা পড়েছে। ত্রিলোচনের সচেতন থাকার প্রতিক্রিয়া বিল্লেসুরের মধ্যে অনুরণিত হল। আবার ভাবল, আমার কি বা ক্ষতি করবে, —ওর মতলব কি তা জানা দরকার, করুণ কণ্ঠে সে বলল, 'হ্যাঁ ভাই, তোমাকে গ্রামের সবাই সমঝদার বলে মনে করে।'

উৎফুল্ল হয়ে ত্রিলোচন বলল, 'এমন মেয়ে এ গাঁয়ে একটিও আসেনি, বছর ষোল বয়স, আগুনের মতো গায়ের রঙ।'

দেবীপ্রতিমার কথা বিল্লেসুরের মনে পড়ল, বিচলিত হয়ে সে নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'তোমার চোখ কখনও ধোঁকা খেতে পারে! কোথাকার মেয়ে?'

—'উঁহু, তা বলছি না। যখন বিয়ে করতে যাবে, তখনই বুঝতে পারবে।'

—'প্রথমে তো আশীর্বাদ করতে হবে। নাকি তার কোনো প্রয়োজন নেই?'

—'আশীর্বাদ হবে, কিন্তু জিগ্যেস টিগ্যেস করতে পারবে না! তেওয়ারিদের মেয়ে। সব কাজ আমার মারফত হবে।'

—'কোন গ্রামের?'

'তাই যদি বললাম, তাহলে আর কি বাকি থাকল? বিয়ের আগে সবকিছু জানতে পারবে। কিন্তু একটা কথা আছে। ওরা ঐখানে বিয়েতে কোনো খরচাপাতি করতে পারবে না। খুবই ভালো মানুষ ওরা। মেয়েকে ওরা বেচবে না। খরচ-খরচা তোমাকেই করতে হবে।'

—'কত?'

ত্রিলোচন হিসেব জুড়তে লাগল—'খুলে বলব, তোমার এখানে আশীর্বাদ করতে এলে থাকবে আমার বাড়িতে। থালায় সাত টাকা, আর নারকেলের সঙ্গে একথান কাপড় দেবে। এতে টাকা বিশেক খরচ হবে। আর ঐ টাকা আশীর্বাদের সাতদিন আগে দিতে হবে। আর, সে টাকা আমার হাতেই দেবে। ওরা সাদাসিধে—ভালো মানুষ, কিন্তু, খরচ করার সামর্থ্য নেই। তোমার কাছে হাত পেতে কেমনভাবে নেবে? বরযাত্রী আসা থেকে শুরু করে বিয়ে, খাওয়া-দাওয়া প্রণামী ইত্যাদি সমস্ত পাট চুকোতে লাগবে দেড়শ' টাকা,—ডালের মধ্যে এক চিমটি নুনও নয়। তোমাকে তো আর ফতুর করতে পারে না। কুলের দিক থেকে তোমার চেয়ে উঁচু।'

বিল্লেসুর বলল, 'কুলের দিক থেকে উঁচু হলে বিয়ে ফলপ্রসূ হয় না। মনু বাজপেয়ী টাকা না থাকার জন্যে নিচু কুলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। সে মেয়ে বিধবা

হয়। ভাই, আমার এটাই ভয়,...'

ত্রিলোচনের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। বলল, 'ঘাবড়িও না, যতটা উঁচু বলে ততটা উঁচু নয়। বাড়িয়ে বলে। মন্নু বাজপেয়ীর মেয়ে তার স্বামীকে খুন করেছিল। শুনেছি, ওর বয়স হয়েছিল, মায়ের কাছে থাকতেই খারাপ হয়। সেজন্যে মন্নু তার মেয়ের বিয়ে নিচু কুলে দেয়। সে তার প্রেমিকের কথা মতো স্বামীকে বিষ দেয়। স্বামী বেশ কিছু দিন ধরে অসুস্থ ছিল, ওষুধ চলছিল।'

—'এ-ও আবার আমার সঙ্গে তা না করে।' বিল্লেসুর শঙ্কিত চোখে ত্রিলোচনকে পরখ করতে লাগল।

—'বলছি তো, কোনো রকম আজেবাজে চিন্তা কোর না। মাঝখানে তো আমি আছি। মেয়ের মধ্যে কোনো দোষ, বা কোনো কলঙ্ক নেই। চাল-চলনও বিগড়ায়নি। কালো নয়, কানা-খোঁড়া ন্যাংড়া-লুলোও না।'

—'তুমি যখন বলছ, তখন পুরোপুরিই বিশ্বাস করছি। কিন্তু ঠিকানা না জানা থাকলে, দশ দিন আগে যে-সব আত্মীয়-স্বজনরা আসবে, তাদের কি বলব? ওদের তো একথা বলতে পারব না যে, ত্রিলোচন ভাই জানে। তাই ঠিকানা জিগ্যেস করছি। তাছাড়া আর একটা কথা আছে—ঠিকুজী বিচার করতে হবে। মেয়ের ঠিকুজী নিয়ে এস। আমি সামনে বসিয়ে বিচার করাব। মেয়ে মঙ্গলী (রাক্ষসগণ) হলে, মৃত্যু না হলেও, মৃত্যুর সমতুল্য হয়। বিয়ে যদি করতেই হয়, দেখেশুনে করাই উচিত।'

ত্রিলোচন মনে মনে রুষ্ট হল। বলল, 'এমন বলছ, যেন তুমি খুব উঁচু ঘরের। তোমার এখানে বিয়ে ঠিক না হলে, কোনো ভালো মানুষ তোমার কাছে আসবে না। ভাদুরে কুত্তার মতো যেমনভাবে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছ, ভেবেছিলাম, তোমার ঘরে বৌ আসুক, কিন্তু তোমার আসল রূপটাই দেখিয়ে দিলে। মনে কর, তুমিই মঙ্গলী হলে, তাহলে কী করবে? তখন, কোন্ বাবা তোমাকে মেয়ে দেবে? থাকল, আত্মীয় স্বজনদের কথা আমি তো এ ব্যাপারে তোমার ষোল আনা বেকুবি ছাড়া আর কিছু দেখছি না। মিছেমিছি পঁচিশ টাকা খরচার বোঝা নিচ্ছ। আমি তো বলি, চুপচাপ বিয়েটা সেরে এস। মেয়ের বাবার নাম যদি জানতে চাও তো ঠিকানাও দিয়ে দেব। কিন্তু, এমন ভাবে যাওয়া তো শোভন না, সারা গাঁয়ে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে টি টি পড়ে যাবে।'

বিল্লেসুরের কিছুটা বিশ্বাস হল। কিন্তু টাকার কথা ভেবে মনটা খচখচ করতে লাগল। মেয়েটির রূপের মোহ তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, অসংখ্য কুঁড়ি যেন ফুটে উঠছিল চারপাশে, সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে, কিন্তু ত্রিলোচনকেও সে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারছিল না। জিগ্যেস করল, 'এখান থেকে কতো দূর?'

—'তিন-চার ক্রোশ তো হবেই।'

বিল্লেসুর ভাবল, একদিনে যেতে পারব, আবার ফিরেও আসতে পারব। বকরিগুলোর খুব একটা কষ্ট হবে না। পাতা ছেঁটে দিয়ে যাব। বলল, 'তাহলে

যাওয়াই যাক। দেখে নেয়া ভালো, যেদিন বলবে সে দিনই যাওয়া যাবে।'

ত্রিলোচন তার মতলবকে বুঝতে না দিয়ে বলল,'বেশ, আজ থেকে চারদিনের মাথায় যাব।'

বারো

সে রাতে বিল্লেসুরের ঘুম হল না। সেই রূপ চোখের সামনে ভাসতে লাগল। খুব ফর্সা। ভাবতে ভাবতে রামরতনের স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। বছর ষোল বয়স, ভাবতেই, রামচরণ শুকুলের মেয়ের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিশ্চয়ই টানা টানা চোখ, পুখরাজ বাঙ্গিয়ের মেয়ে হাসিনার যেমন চোখ, তেমনি। এ-ঘরে বৌ হয়ে এলে, ঘর ঝলমল করে উঠবে। যে ঘরে বকরির বাচ্চাগুলোকে রাখা হয়, সেই ঘরে ওর জিনিসপত্র থাকবে। বাচ্চাগুলো বৈঠকখানায় থাকবে। আর একটা ঘর না হয় ছেয়ে নেব, বকরিগুলো সব মরশুমেই আরামে থাকবে।

বিল্লেসুর একবারের জন্যে ভাবল না, বকরির নাদের দুর্গন্ধে সেই মহিলা একদিনের জন্যেও এ বাড়িতে টিকতে পারবে কিনা।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে পাশের গ্রামে সে কাপড়ের দোকানে গেল। জামার কাপড় কিনল, গোলাপী রঙের পাগড়ি কিনল, একটা ধুতিও নিল। দর্জিকে জামার মাপ দিল। সেদিনই তৈরি করে দেয়ার জন্যে বলল। গ্রামের মুচির কাছ থেকে একজোড়া জুতো কিনল।

এদিকে এসব কেনাকাটা করছিল, আর অন্যদিকে ভাবছিল, ত্রিলোচন কোথায়! তৃতীয় দিনে ত্রিলোচন বাড়ি থেকে বের হল। সাজগোজ এবং হাতে লাঠি দেখে বিল্লেসুর বুঝল, ত্রিলোচন যাচ্ছে, লক্ষ্য রেখে ও দূর থেকে ওর পিছু নিল। ত্রিলোচন বাবু সোজা পূরবার কাঁচা রাস্তা ছেড়ে মোড় নিল। বিল্লেসুর দূরে পূরবার সীমানায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। যখন দেখল ত্রিলোচন পূরবা ছেড়ে অন্য কোনো গ্রামে গেল না, তখন বিল্লেসুরের বিশ্বাস হল, সে এ গ্রামেই আছে, সেও গ্রামের মধ্যে ঢুকল। গ্রামে ঢোকার মুখেই একজনের সঙ্গে তার দেখা হল। বিল্লেসুর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে শ্যামপুরের ত্রিলোচন এসেছে?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, রামনারায়ণের বাড়িতে আছে, ঠগবাজ কোথাকার। দু'টোই এক পদের। কারও হয়তো গলা কাটার ফন্দি আঁটছে।'

বিল্লেসুরের বুকের ভেতর ধ্বক করে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'রামনারায়ণের ছেলে-মেয়ে আছে?'

লোকটি চমকে উঠে বিল্লেসুরকে দেখতে লাগল, 'তুমি কোথায় থাক?

রামনারায়ণকে তুমি চেন না? ঐ শালার ছেলে-মেয়ে! জিজ্ঞেস কর, বিয়ে করেছে কিনা?'

লোকটি আর বেশি কিছু না বলে চলে গেল। বিল্লেসুরের নিজেকে খুব কাহিল মনে হতে লাগল। সে মন্নীর শ্বশুর বাড়ির দিকে রওনা হল। মন্নীর শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করল। ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখের কথা হল। বিল্লেসুর তাকে সান্ত্বনা দিল। বলল, 'খরচ-খরচার জন্যে দরকার পড়লে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও।' বলে সে তার হাতে একটা টাকা দিল। বলল, মন্নী ভালোই আছে। ওর মেয়ের খুব সেবাযত্ন করে, মন্নী ওর ওপর নজর রাখে, এখন ও বড় হয়েছে।

মন্নীর শাশুড়ি খুব খুশী হল। টাকা নিয়ে বিল্লেসুরকে জিজ্ঞেস করল, ঘরে বৌ এনেছ, না আন নি? বিল্লেসুর জবাবে বলল, 'ঘরে বৌ তো বাবা-মা আনেন।' মন্নীর শাশুড়ি বলল, 'দশ-পনেরো দিন পরে যখন যাব, তখন বিয়ের পাকা কথা বলব।' বিল্লেসুর প্রণাম করে বিদায় নিল।

তেরো

পরের দিন ত্রিলোচন এল, বিল্লেসুরকে বলল, 'বিল্লেসুর, তৈরি হয়ে চল।'

বিল্লেসুর বলল, 'আমি তো আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছি।'

ত্রিলোচন খুশী হয়ে বলল, 'বেশ, তবে রওনা হওয়া যাক।'

বিল্লেসুর বলল,'ভাই, মন্নীর মাসি-শাশুড়ির ভাইঝির শ্বশুর বাড়িতে একটি মেয়ে আছে। কালকে ওরা এসেছিল। কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। আমাকে মাফ কর।'

ত্রিলোচনের গোঁসা হল, বলল, 'এ বিয়েতে নিশ্চয়ই কোনো গলদ আছে। তেমনি মেয়ে হবে, আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

হেসে বিল্লেসুর বলল, 'আর তোমারটা দুধে-ধোয়া? মন্নীর মাসি-শাশুড়ির ভাইঝির শ্বশুর বাড়ির মেয়ের মধ্যে দোষ আছে? আর তোমারটা—যার না আছে বাপের ঠিক-ঠিকানা, না আছে মা, না কোনো গ্রাম না কোনো আত্মীয়স্বজন, সিল্কের পর্দা টাঙানো আছে, না?'

—'দ্যাখ, পরে আফশোস করবে।' ত্রিলোচন গলা চড়িয়ে বলল।

—'আফশোসের কোনো কাজ আমি করি না, অনেক বুঝে সুঝে আমি পথ হাঁটি, ত্রিলোচন ভাই।' বিল্লেসুর বেশ কড়া জবাব দিল।

—'বেশ, না হয় গিয়ে একবার মেয়ে দেখে এস। তোমাকে মেয়ে দেখিয়ে দেবে।'

—'যেখানে মেয়েই নেই, মেয়ের ঠাকুরমাকে দেখালেও আমি যাব না। যখন নিজেদের ঘরে, আত্মীয়ের মধ্যে মেয়ে আছে, তখন অন্য কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। এতে ধর্মকে ত্যাগ করা হবে। গৃহস্থের মেয়ের রূপ দেখা উচিত নয়, গুণ দেখা উচিত। প্রবচন আছে, রূপবতী নারীর চাল-চলন খারাপ হয়।'

—'ওঃ, তাহলে যে আসছে, সে সতী-সাবিত্রী! দেখ, গ্রামের ছোকরাদের হাত থেকে যদি বাঁচাতে পার।'

—'তা আমি জানি। কিন্তু ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যাবে না, তা দেখে নিও। দুঃখ-কষ্ট এলে, সহ্যও করবে। কারও ধর্ম নষ্ট করলে, ধর্ম নষ্ট হয় না। গ্রামের সবার হাঁড়ির খবর আমি রাখি।'

—'তুই সবাইকে দোষ দিচ্ছিস।'

—'আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, সত্য কথাই বলছি।'

—'বেশ বল, আমার মধ্যে কি দোষ আছে, না বললে...'

—'তুমি এখান থেকে চলে যাও, না হলে আমি চৌকিদারের কাছে যাচ্ছি।'

চৌকিদারের নাম শুনে ত্রিলোচন চলে গেল। করুণা মিশ্রিত ক্রোধ নিয়ে সে বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল।

বিল্লেসুর নিজের কাজ সারবার জন্যে বাইরে বেরুল।

চৌদ্দ

কার্তিক মাস শুরু হতেই মন্নীর শাশুড়ি এল। বেশ একটু ঘুরতে হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে বাড়ি খুঁজে বের করেছে। বিল্লেসুর তাকে দেখে ঝপ করে প্রণাম করল। বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। খাটিয়া পেতে দিল। খাটিয়ার ওপর একটা চট বিছিয়ে দিয়ে বলল, 'মা, বস।'

খাটিয়াতে বসতে বসতে মন্নীর শাশুড়ী বলল, 'আর তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে।'

বিল্লেসুর বলল, 'ছেলেদের দাঁড়িয়ে থাকাই দরকার। আপনার মেয়ে আছে, তাতে কি হয়েছে? মেয়েও যেমন, ছেলেও তেমন। আমার চাইতে না হয় বয়সে বড়ই। আপনি তো আমার ধর্ম মা। যে জন্ম দেয়, তাকে পাপের মা বলে। তুমি বস, আমি এখুনি আসছি'।

বিল্লেসুর গ্রামের বেনের দোকানে গেল। এক পোয়া চিনি নিল। ফিরে এসে বকরির দুধে চিনি মিশিয়ে লোটা ভর্তি করে খাটিয়ার একধারে রাখল। গ্লাসে জল এনে বলল, 'নাও মা, কুলকুচি করে নাও। হাত-পা যদি ধুতে চাও বালতিতে জল রাখা আছে, বসে বসে গ্লাস দিয়ে ধুয়ে নাও।' বলে দুধ-ভর্তি লোটা তুলে নিল।

মন্নীর শাশুড়ি হাত-পা ধুল। বিল্লেসুর লোটা থেকে দুধ ঢালতে লাগল, আর মন্নীর শাশুড়ি খেতে লাগল। খেয়ে বলল, 'বাবা, আমি বকরির দুধই খাই। এ দুধ খাওয়া ভালো, সমস্ত রোগের মূল নষ্ট হয়ে যায়।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। আকাশ পরিষ্কার ছিল। তেঁতুল গাছে পাখি কিচিরমিচির করছিল। বিল্লেসুর আকাশের দিকে চেয়ে বলল, 'এখনও সময় আছে, মা তুমি বস। আমি এখুনি আসছি। বকরিগুলোর ওপর নজর রেখ, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। এলে, খুলে দিও। মা, এখানে বকরি চোর আছে।' বিল্লেসুর বাইরে বেরুল। মন্নীর শাশুড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

সোজা খেত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বিল্লেসুর রামগুলাম কাছীর সবজির খেতে এল। রামগুলাম তখনও খেতেই ছিল। বিল্লেসুর জিজ্ঞেস করল,' কি আছে?' রামগুলাম বলল, 'বেগুন আছে, করলা আছে— কি চাই?' বিল্লেসুর বলল, 'এক সের বেগুন দাও। কচি দেখে দিও।' রামগুলাম গাছ থেকে বেগুন তুলতে লাগল। বিল্লেসুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেগুন গাছের সবজে-আভার দিকে চেয়ে রইল। এক-একটা গাছ যেন সটান দাঁড়িয়ে বলছে, 'দুনিয়াতে আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।' রামগুলাম গাছ থেকে বেগুন তুলে ওজন করল, যেদিকের পাল্লায় বেগুন, সেদিক ঝুঁকে গেছে দেখিয়ে বিল্লেসুরের গামছায় বেগুন ঢেলে দিল। বিল্লেসুর প্রথমে গামছায় গিঁট মারল, তারপর গ্যাঁট থেকে এক পয়সা বের করে রামগুলামকে দিল। রামগুলাম বলল, 'আর এক পয়সা দাও।' বিল্লেসুর মুচকি হেসে বলল, 'গাঁয়ের লোকের কাছ থেকেও কি বাজারের দর নেবে?' রামগুলাম বলল, 'কে আর প্রতিদিন গামছা বাড়িয়ে দেয়, বল? আজ হয়তো মন চাইছে, না হয় কোনো আত্মীয় এসেছে।' বিল্লেসুর বলল, 'ঠিকই বলেছ, বাকিটা কালকে নিও। এখন কাছে নেই।' বিল্লেসুরের ঝোল-তরকারি খাওয়ার ইচ্ছে করলে ছোলা ভিজিয়ে রাখে তারপর তেল-মশলা দিয়ে ছেঁকে ঝাল-ঝোল বানিয়ে নেয়। ফেরার পথে মুরলী কাহারকে বলল, 'কালকে দিন থাকতে থাকতে আমাকে দু'সের পানিফল দিয়ে যেও।' তারপর বাড়িতে ফিরল, দরজা খোলাল। প্রদীপ জ্বালিয়ে বকরি দুইল। ভোরে ছেঁটে রাখা পাতা বকরিদের দিয়ে রান্না ঘরে গেল রুটি বানাতে। রুটি, ডাল, ভাত, বেগুনের তরকারি, আমের আচার, বকরির গরম গরম দুধ এবং চিনি দিয়ে পিঁড়ে পেতে জল রেখে সে শাশুড়িকে বলল, 'মা চল, খেয়ে নাও।' মন্নীর শাশুড়ি লজ্জিত হয়ে উঠে বসল, হাত-পা ধুয়ে রান্নাঘরে বসে আনন্দে খেতে লাগল। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, ' তোমার তো মোষ নেই, কিন্তু মোষের ঘি বলে মনে হচ্ছে।' বিল্লেসুর বলল, 'গৃহস্থের বাড়িতে মোষের ঘি রাখতে হয়, কেউ এলে দিতে হয়, নিজে বকরির ঘি-ই খাই।' মন্নীর শাশুড়ি চেটেপুটে খেল। হাত-মুখ ধুয়ে খাটে গিয়ে বসল। বিল্লেসুর মশলাদানী থেকে এলাচ বের করে দিল। তারপর সে নিজে খেতে বসল। অনেকদিন পরে তৃপ্তির সঙ্গে খেল। খেয়ে প্রতিবেশীর কাছ থেকে খাটিয়া চেয়ে নিয়ে এল।

খাটিয়া পেতে, খাটিয়া থেকে চট তুলে নিজের খাটিয়াতে বিছাল, আর মন্নীর শাশুড়ির জন্যে বাংলা থেকে নিয়ে আসা রঙিন সতরঞ্চি বিছিয়ে দিল, আর সেখানকার গুরুদেবের স্ত্রীর পুরনো শাড়ির ওয়ার-দেয়া বালিশ দিল। শাশুড়ি শুয়ে পড়ল। আর চোখ বন্ধ করে বিল্লেসুরের বকরির কথা ভাবতে লাগল। বিল্লেসুর যখন কাছীর খেতে গিয়েছিল, তখন সে প্রতিটি বকরি ভালো করে পরখ করেছে। গুণে সে বিস্মিত হয়েছে। যত বকরি আর বাচ্চা আছে, তাতে তিন-তিনটে মোষ পুষলেও এত মুনাফা হবে না।

বিল্লেসুর ছিল ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। মন উতলা হয়ে উঠলেও, বিয়ের ব্যাপারে সে সামান্যতম ইঙ্গিতও করল না। ভাবল, আজকে ক্লান্ত, আরাম করুক, কালকে নিজেই কথা তুলবে, না হলে এখানে কি শুধু শুধু মুখ দেখানোর জন্যে এসেছে!

বিল্লেসুর শুয়েছিল, হঠাৎ পাশের খাট থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার একটা শব্দ ভেসে এল। শাশুড়ি শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ উচ্চকিত হয়ে উঠল। তারপর কান্নার স্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। বিল্লেসুর ভয় পেল, খাওয়া-দাওয়ার পর কান্নার এমন কি কারণ ঘটল? বুকটা ধ্বক করে উঠল, তবে কি বিয়ে হবে না, একি তারই আগাম ভনিতা। ঘাবড়ে গিয়ে বিল্লেসুর জিজ্ঞেস করল, 'মা, কাঁদছ কেন?' মন্নীর শাশুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'জানি না বাছা, কোন দেশান্তরে আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছে! যখন থেকে গিয়েছে, একটি চিঠি পর্যন্ত দেয়নি।'

বিল্লেসুর তাকে সান্ত্বনা দিল, 'মা, তুমি কেঁদ না, বৌদি বহাল তবিয়তে আছে। মন্নীভাই তার খুব সেবাযত্ন করছে। আমি যেখানে ছিলাম, মন্নী সেখান থেকে অনেক দূরে থাকত। খবরা-খবর পেতাম। লোকমুখে শুনেছি, ভালো চাকরি করছে। সারা মনপ্রাণ দিয়ে বৌদির কথাই ভাবে। বৌদি এখন আর এতটুকু ছোট নেই। লোকে বলছিল, 'বিল্লেসুর, আর দু-তিন বছরের মধ্যে তোমার ভাইপো হবে।'

'শ্রীরামের কৃপায় সে যেন সুখে-শান্তিতে থাকে। আমাকে তো ধোঁকা দিয়ে গিয়েছে। আমার আবার কে-ই বা আছে? যে-ভাবে দিন কাটছে, তা শুধু আমার আত্মাই জানে,' বলে মন্নীর শাশুড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিল্লেসুর বলল, 'মন্নী তোমার যেমন, আমিও তেমনি। তুমি এখানেই থাক। তুমি থাকলে, তোমার বানানো দু'টি রুটি আমিও পাব।'

মন্নীর শাশুড়ি খুব প্রসন্ন হল। বলল, 'বাছা, তুমি সুখে থাক। তুমিই আমার ভরসা। এসেছি যখন, তখন কিছুদিন এখানে থাকব। তোমার এখানকার কাজকর্ম দেখে নিই। বিয়ের কথা যখন উঠেছে, হয়ে গেলে তোমার ঘর গৃহস্থী কি রকম·তা বুঝিয়ে দেব।'

'এর থেকে ভালো কথা আর কি হতে পারে,' বিল্লেসুর পৌরুষ দেখিয়ে বলল।

মন্নীর শাশুড়ি বলল, 'এখন পর্যন্ত তোমাকে বলা হয়নি, যখন ফুরসৎ

পাবে—নিশ্চিন্তে বসবে, তখন বলব। বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে। মেয়েও তোমার মতো চালাক-চতুর। কিন্তু আমার মেয়ের মতো পরিষ্কার রঙ নয়। চাল-চলন ব্যবহার খুব ভালো। ঘর-গৃহস্থালীর কাজ সামলাতে পারবে। বল, রাজি আছ?'

বিল্লেসুর ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলল, 'আপনিই জানেন, আপনি রাজি থাকলে, আমিও রাজি।'

মন্নীর শাশুড়ি প্রসন্ন হল। বলল, 'বেশ, তাহলে বিয়ে কর। তোমার সঙ্গে থাকলে ওরও কোনো কষ্ট হবে না। শুধু সামান্য একটু সাহায্য ওর মাকে নিয়মিত করতে হবে। বেশি নয়, বিয়ের আগে তিরিশ টাকা দিও। ওরা গরীব, কিছু ধার দেনা আছে। তারপর কিছু কিছু দিতে থাকবে। ওরও আর কেউ নেই। আমি মেয়েকে তোমার এখানে নিয়ে আসব। এখানেই বিয়ে হবে। বরযাত্রী যদি ওদের ওখানে নিয়ে যাও, তবে সব খরচ তোমাকেই করতে হবে। এতে বেশিই খরচ পড়বে। বাড়িতে তোমার দু-চারজন আত্মীয়কে ডেকে বিয়ে সারবে, ভালোয় ভালোয় হয়ে যাবে।'

বিল্লেসুর বুঝতে পারল, ওর কথার মধ্যে কোনো ছলচাতুরি নেই। বলল, 'হ্যাঁ, খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছ।'

মন্নীর শাশুড়ি কয়েকদিন থাকল। বিল্লেসুরকে রান্নাবান্না করে খাওয়াল। কয়েকদিনেই বিল্লেসুরের চেহারায় জেল্লা এল। বিল্লেসুর সাগ্রহে তাকে বলল, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে এখানেই থাকুক। মন্নীর শাশুড়িও রাজি হয়ে গেল।

গ্রামে বিল্লেসুরের খুব চর্চা শুরু হল। একদিন ত্রিলোচন মন্নীর শাশুড়িকে পাকড়াও করল। বলল, 'বল দেখি, বিয়ে কোথায় ঠিক করলে?'

মন্নীর শাশুড়ি বলল, 'আমার আত্মীয়ের মধ্যে।'

'ওরা কোথায় থাকে?' ত্রিলোচন জিজ্ঞেস করল।

'কেন, তুমি বিল্লেসুর নাকি?' চোখ নাচিয়ে মন্নীর শাশুড়ি জিজ্ঞেস করল, তারপর বলল, 'বাছা, আমার চোখে জ্যোতি আছে, আমাকে কি ছানিপড়া বলে মনে হয়! এখন তোমাকে জিজ্ঞেস করি, বাপু, তুমি বিল্লেসুরের কে হও?'

ত্রিলোচন ঠিক সুবিধে করতে পারল না। বলল, 'ওঃ, আমি কে হই, এই বিয়ে হলে যখন জল বন্ধ হবে, তখন বলব আমি কে?'

'আত্মীয়স্বজন যার সাথে আছে, স্বয়ং পরমাত্মাও তার জল বন্ধ করতে পারে না। ঢের হয়েছে, এখন আমার বাড়ি থেকে বেরও তো, আর গ্রামে গিয়ে জল বন্ধ করগে।' ত্রিলোচন জড়সড় মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

খুব আনন্দে দিনগুলি কাটছিল। বিল্লেসুরের খেতে মিষ্টিআলুর খুব ফলন হয়েছিল। কয়েকদিন মিষ্টিআলু পুড়িয়ে বকরির দুধে দিয়ে শাশুড়িকে খাওয়াল। মন্নীর শাশুড়ি মন্নীর ওপর যতখানি অপ্রসন্ন ছিল, বিল্লেসুরের প্রতি ততোখানিই প্রসন্ন হল। সে বিল্লেসুরের পরিত্যক্ত বাগানের এক একটি গাছ, মিষ্টিআলুর প্রতিটি লতা দেখেছে।

সে এখানে থাকার জন্যে বিল্লেসুর রাতে মিষ্টিআলুর খেতে পাহারা দিতে লাগল। দু-একদিন জংলী শুয়োর খেতে ঢোকে, চোরও কয়েকদিন মাটি খুঁড়ে মিষ্টিআলু চুরি করে নিয়ে যায়। এখনও লতা হলুদ হয়ে ওঠেনি। লোকসান হচ্ছে দেখে মন্নীর শাশুড়ি তাকে সমস্ত মিষ্টিআলু তুলে আনার পরামর্শ দিল। বিল্লেসুর তা-ই করল। সে ঘরে মিষ্টিআলুর ঢের লাগিয়ে দেখল, সারা ঘর মিষ্টিআলুতে ভরে গেল। এক-একটা মিষ্টিআলু যেন শিলনোড়ার মতো। মন্নীর শাশুড়ি মিষ্টি হেসে বলল, 'এ দিয়ে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে, আর খাওয়ার জন্যে অনেক মিষ্টিআলু বেঁচে যাবে।' মিষ্টিআলুর দিকে আশাভরা চোখ নিয়ে দেখতে দেখতে বিল্লেসুর বলল, 'মা, সব তোমারই আশীর্বাদ। না হলে আমার কি ক্ষমতা আছে?' শাশুড়ি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার ছেলে বেঁচে থাকলে তোমার বয়সী হত, চাষ-আবাদ করত, আমাকে এমনভাবে এ-দোরে সে-দোরে ঘুরে ঘুরে দিন কাটাতে হত না।' বিল্লেসুর তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমিই তোমার ছেলে। তুমি কোনোরকম চিন্তা কর না। যতদিন আমি বেঁচে আছি, তোমার সেবাযত্ন করব। দুঃখ কর না।' শাশুড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। বিল্লেসুর অন্য গ্রামে গেল মিষ্টিআলুর খদ্দের জোগাড় করতে। ভাবল, ফিরে এসে না হয় বকরিগুলোর জন্যে পাতা ছাঁটব। পরের দিন খদ্দের এল। বিল্লেসুর সত্তর টাকায় মিষ্টিআলু বিক্রি করে দিল। সারা গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। লোকের বুক টাটাচ্ছিল। পরের বছর তারাও মিষ্টিআলুর চাষ করবে বলে ঠিক করল।

পনেরো

কার্তিক মাসের জ্যোৎস্না চারদিকে থৈ থৈ করছিল। হালকা শীত পড়ছিল। সবন জাতের পাখিগুলো কোত্থেকে যেন উড়ে এসে সারা শীতকালটা তেঁতুল গাছের মগডালে বাসা বাঁধে, পাখির কলকণ্ঠে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। বিল্লেসুর রাতে উঁচু দাওয়ায় বসে আকাশকে নিরীক্ষণ করত। সান্ধ্য আকাশে হরিণ-হরিণীকে যেখানে দেখেছে, এখন সেখানে নেই। বিল্লেসুরের ধারণা, তারা যখন যেখানে ঘাস দেখে, সেখানে ঘাস খেতে যায়। সন্ধ্যা থেকেই শিশির পড়ে, সেজন্যে অনেক রাত পর্যন্ত কেউ আর বাইরে বসে না। লোকে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। বিল্লেসুর বাড়িতে ফিরল। মন্নীর শাশুড়ি প্রতিদিনের মতো রুটি তৈরি করে রেখেছিল। এদিকে বেশ কয়েকদিন ধরে মন্নীর শাশুড়ির তৈরি রুটি খেতে খেতে বিল্লেসুরের গায়ে গতরে জেল্লা ফুটে বেরুচ্ছিল। পা ধুয়ে বিল্লেসুর রান্না ঘরে গেল। মন্নীর শাশুড়ি পরিপাটি করে সাজিয়ে খাবার দিল। শাশুড়িকে দেখানোর জন্যে বিল্লেসুর প্রতিদিন অগ্রাসন বের করে দেয়। খাওয়া শেষ হলে অগ্রাসন হাতে তুলে

নেয়। অগ্রাসন রেখে, হাত-মুখ ধুয়ে এবং কুলকুচি করে বকরির বাচ্চাগুলোকে খাবার দেয়। অগ্রাসন রাখার আগে লোটা থেকে জল নিয়ে তিনবার থালার চারপাশে ঘোরায়। অগ্রাসন রাখার পর টুং টাং করে লোটা বাজিয়ে চোখ বন্ধ করে। এই কৃত্য সে আজও করল।

যখন সে খেতে শুরু করল, তখন শাশুড়ি অত্যন্ত দীনতার সঙ্গে দাঁত বের করে বলল, 'বাবা, অঘ্রান মাস এসে গেল বলে, তুমি বললে আমি যেতে পারি।' তারপর কেশে বলল, 'ওখানকার কাজ তো আমাকেই করতে হবে।'

গ্রাস গিলে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বিল্লেসুর বলল, 'হ্যাঁ, ঐ কাজও তো দেখতে হবে'।

'সে কথাই তো বলছি।' বলে, আর একটু কাছে ছেঁচড়ে এসে শাশুড়ি বলল, 'কিছু টাকা এখুনি দিয়ে দাও, আর বাকি টাকা বিয়ের দু-তিনদিন আগে দিও।'

টাকার কথা শুনে বিল্লেসুরেব মনটা টনটন করে উঠল। কিন্তু টাকা ছাড়া বিয়েও হবে না, ভেবে, সে বিয়ে পাকাপাকি করার জন্যে উতলা হয়ে উঠল। বলল, 'মা, এখন পর্যন্ত কোনো পন্ডিত দিয়ে বিচার করা হল না, যদি যোটক না মেলে, তবে?'

'বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলছ!' মন্নীর শাশুড়ি পূর্ণ বিশ্বাসে মাথা উঁচু করে বলল, 'ওর মধ্যে কোনোই দোষ নেই, তাহলে বিয়ে হবে না কেন? বাবা, ও খুব শান্তশিষ্ট মেয়ে। আর ওর বিয়ের কথা বলছ? বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। রামখেলাওন বিদেশ থেকে এসেছিল, ফিরে যাওয়ার সময় হাতজোড় করে বলল, 'কাকি, বিয়ে দিয়ে দাও, যত টাকা চাও দেব।' মেয়ের মাকে রাজি করিয়ে ঠিকুজী নিয়ে বিচার করতে গেল, যোটক ধাঁই করে মিলে গেল। মেয়ের মাকে তিরিশ টাকা নগদ দিচ্ছিল। কিন্তু ভাগ্য! মেয়ের মা বলল, 'আমার মেয়েকে বিদেশ-বিভূঁই-এ নিয়ে যাবে, আর কোনোদিন এদিকে পথ মাড়াবে না। অসুখ-বিসুখ হলে, এক ফোঁটা জল চাইলে কে আমার মুখে জল দেবে, টাকা নিয়ে আমি কি করব? বিয়ের সব ঠিকঠাক, কিন্তু ভেঙে গেল। তারপর চুকন্দরপুরের জমিদার রামনেওয়াজ এল। তার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা সব পাকা। আশীর্বাদের দিন গ্রামের কোনো শরিক ওকে বোঝাল, রামনেওয়াজ তার নিজের বাপের ছেলে নয়, ব্যাস, আর কি, বিয়ে ভেস্তে গেল। কত বিয়ে ঠিক হল, কিন্তু সবকটাই ভেঙে গেল।'

বিল্লেসুর বুঝতে পারল, মেয়ের রক্তে কোনো দোষ নেই। সে তৃপ্তি অনুভব করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। মন্নীর শাশুড়ির ভাবাবেগ তখনও শান্ত হয়নি, বাঙালী মেয়েদের মতো চটকদার কণ্ঠে বলল,'তোমাকে বলেই বলছি, তুমি নিজের লোক, অনেক সত্য-মিথ্যা কথা যদি না বলতাম, তবে বিধবা তোমাকেও মেয়ে দিত না।'

উষ্মা প্রকাশ করে বিল্লেসুর বলল,'তুমি যে বললে, ওরা খুব ভালো মানুষ!'

'বাবা, বলার জন্যে বলা হয়। ভালো মানুষ সবাইকে বলা হয়, কিন্তু যত ভালো মানুষই হোক না কেন, কেউ নিজে হারতে চায় না। তাছাড়া, দশ কাঠা জমির মালিক,

তোমার কাছে কিভাবে মেয়ে বিয়ে দেয়? ওকে বুঝিয়েছি, দুর্গাদাসের সুকুল, পরদেশ থেকে কামিয়ে এসেছে। যদি বল, একসঙ্গে নগদ ফেলুক, তা পারবে না, ধীরে ধীরে দেবে। আর শেষ পর্যন্ত যাবেই বা কোথায়, তাই রাজি হয়ে গেল। তাই তোমাকে বলছি, তিরিশ টাকা বিয়ের আগে আগাম দাও, তারপর ধীরে ধীরে সাহায্য করতে থাক।' শাশুড়ি গোল গোল চোখ করে বিল্লেসুরকে দেখতে লাগল। এত কমে রাজি না-হওয়া মানে মূর্খতা মনে করে বিল্লেসুর বলল,'বেশ, কালকে ঠিকুজী আর একটাকা নিয়ে রওনা দিও। তিন-চারদিন পরে গিয়ে পণ্ডিতকে জিগ্যেস করব, 'কেমন যোটক দেখলে?'

'একবার নয় বাবা, দশবার মিলিয়ে দেখ। কিন্তু যখন আসবে কমসে কম পনেরো টাকা নিয়ে এস।'

গম্ভীরভাব নিয়ে বিল্লেসুর উঠে দাঁড়াল। হাত-মুখ ধুতে লাগল। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে দিতে শাশুড়ি খেতে বসল। খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনেই ঘুমতে গেল, আর দু'জনেই যে যার সমস্যার কথা ভাবতে লাগল। কেউ কারও সাথে আর কথা বলল না। দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, আকাশে তারা আছে ; মন্নীর শাশুড়ির ঘুম ভাঙল, আর বিল্লেসুরের যাতে ঘুম ভেঙে যায়, সেজন্যে উচ্চকণ্ঠে রাম নাম জপ করতে লাগল।

বিল্লেসুর উঠে বসল, চোখ কচলে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে জিগ্যেস করল, 'মা, ভোর-ভোরেই কি বেরিয়ে পড়তে চাও?'

মন্নীর শাশুড়ির দু'চোখ জলে ভরে উঠল। বলল, 'বাবা, আর দেরি করা ঠিক হবে না। বেলা করে রওনা হলে রাত হয়ে যাবে। কোনো কাজ হবে না।'

বিল্লেসুর অন্ধকারে হাতড়ে সিন্দুক থেকে ঠিকুজী বের করল, শাশুড়িকে দিতে দিতে বলল, 'দেখবে, যেন হারিয়ে না যায়।'

'না বাবা, হারাবে কেন?' বলে শাশুড়ি আগ্রহ সহকারে ঠিকুজী নিল। বিল্লেসুর ট্যাকথেকে একটাকা বের করে শাশুড়ির হাতে দিয়ে প্রণাম করল। বলল, 'তোমাকে এমন কিছু আমি দিচ্ছি না।'

'বাবা, আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি?' অসন্তুষ্ট হয়েছে, তা বিল্লেসুরকে বুঝতে না দিয়ে শাশুড়ি রওনা দিল। রাস্তায় এসে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল এবং নিজের গাঁয়ের রাস্তা ধরল। তখন ভোর হয়ে গিয়েছে।

ষোল

এদিকে বিল্লেসুর মস্ত বড় কাজ করল। মিষ্টিআলুর খেতে মটর বুনে দিল। আর ঐদিককার খেতে যে ছোলার চাষ করেছিল, তা এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

কাজ করতে করতে বিল্লসুরের এক-একবার শাশুড়ির কথা মনে হচ্ছিল। বিয়ের লতানো গাছে যেন কলি এসেছে, মন খুশীতে ভরে উঠছিল। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে পড়ছিল, নিঃশ্বাস বার বার রুদ্ধ হচ্ছিল, সারা দেহের লোম খাড়া হয়ে উঠছিল।

শেষে যাওয়ার দিন এল। বিল্লেসুর দুধ দুয়ে, একটা হাঁড়িতে বেড় বেঁধে, দুধ নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হল। রাতে ছেঁটে-রাখা পাতা বকরিগুলোর সামনে দিল।

তারপর জল ভর্তি করে বাড়ির মধ্যে স্নান করল। কিছুক্ষণ পুজো-আচ্চা করল। প্রতিদিন পুজো করে, তা নয়। পুজো করতে করতে কখনও চোখ এবং ভুরু উঠিয়ে-নামিয়ে, কখনও গাল ফুলিয়ে-চিপকে, ঠোঁট খুলে-বন্ধ করে আয়নায় দেখল। চোখ প্রসারিত করে অনেকক্ষণ ধরে বসন্তের দাগ দেখতে লাগল, তা কতখানি মিলিয়ে গিয়েছে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে অশুদ্ধ উচ্চারণে গায়ত্রী পাঠ করল, গায়ত্রী পাঠের সময় তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, এ কাজ ভালোয়-ভালোয় হয়ে যাবে। পুজো-পাঠ শেষ করে ঘরের ভেতরের তাক থেকে বাসি রুটি নামাল। খেয়ে হাত-মুখ ধুল, কাপড় পরতে লাগল। মোজার নিচ পর্যন্ত টেনে ধুতি পরল, তারপর জামা পরে খাটিয়ায় বসল, বসে পাগড়ি বাঁধতে লাগল। পাগড়ি বেঁধে আর একবার সে ভাবে আয়নায় নিজেকে দেখল, নানা ধরনের মুদ্রা করতে লাগল। তারপর পকেটে ছোট্ট একটা আয়না রেখে, গলায় ময়লা গামছা এবং মোটা চাদর ঝুলিয়ে লাঠি তুলে নিল। জুতোতে আগেই তেল মর্দন করেছিল, জুতো পরল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা দিল, দু-নাকের মধ্যে সুরসুর করছিল, নাক টিপল, টিপে সেখানে ডান পা তুলে তিনবার লাথি মারল, তারপর দুধের হাঁড়ি তুলে চোখ নিচু করে গম্ভীর মুখে রওনা হল।

কিছুদূর যাওয়ার পর ভরা-কলস দেখল। মন খুশীতে ভরে উঠল। যার কাঁখে কলস ছিল, সে শুভর কথা ভেবে মুচকি হাসল। বলল, 'আমার মিষ্টি কবে পাচ্ছি?' 'কাজ ভালোয় ভালোয় মিটে যাক'— মাথা কাৎ করে এই আশ্বাস দিয়ে বিল্লেসুর সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

পথে নালা পড়ল। নালার ধারে রিয়াঁ আর বাবলা গাছ। শুকনো পাড় ধরে সার সার চলে গিয়েছে। বিল্লেসুর বেনের পুকুরের পাড় ধরে এগিয়ে চলল। বিল্লেসুরকে দেখে কয়েকটা বক পুকুরের এপার থেকে ওপারে উড়ে গেল। বিল্লেসুর এগিয়ে চলল। শামশেরগঞ্জের মোড় পড়ল। একটা জায়গায় কয়েকটা খেজুর আর

তাল গাছ দেখতে পেল। সামনেই ঢেউ-খেলা সবুজ খেত। শিশিরের ওপর সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের সামনে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ রং উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল, আবার হারিয়ে যাচ্ছিল। ওর হৃদয়ে একটা আনন্দ দোল খাচ্ছিল। বিল্লেসুর হন হন করে হাঁটছিল। মনেই ছিল না, ওর হাতে দুধের হাঁড়ি আছে।

কাঁচা রাস্তার দু'ধারে সার সার আম আর মহুয়ার গাছ। শীতের মিষ্টি সোনালী রোদের মধ্যে দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছিল। সারা দুনিয়া ওর কাছে সোনালী বলে মনে হচ্ছিল। দারিদ্র্যের রঙ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। ছোট-বড় সমস্ত গাছ-গাছালির ওপর মরশুমের ছাপ, আর সে ছাপ ওর ওপরও পড়ছিল। অনুকূল হাওয়ায় তোলা পালের মতো সে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, এই কারবারে ওর শুধু লাভ, আর লাভই হবে। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। যতদূর চোখ যায়, হাওয়ায় দোল খাচ্ছে সবুজের তরঙ্গ। সেই তরঙ্গের সঙ্গে তার হৃদয় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে—যেন সেই সবুজের মতো সেও তরঙ্গ মুখর হয়ে উঠেছে।

আশা সফল হলে যেমন হয়, তেমনি খেত আর বাগ-বাগিচার মধ্যে দিয়ে গ্রামের বাড়ি-ঘর চোখে পড়ল। বিল্লেসুর উত্তেজনায় এগিয়ে চলল। বড় রাস্তা ধরে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। কুয়োর পাশে স্নানের জন্যে তৈরি করা পিঁড়ির মতো একটা জায়গায় বসে একজন বৃদ্ধ সূর্যের দিকে মুখ করে কাঁপা-কাঁপা হাতে মালা জপ করছিল। আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর ছুতোরদের বাড়ি চোখে পড়ল। গাড়ির চাকা বানানোর ঠক্ ঠক্ শব্দ বহুদূর পর্যন্ত গুঞ্জরিত হচ্ছিল। একটু পরেই দর্জির দোকান চোখে পড়ল। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। দর্জি মাথা নিচু করে খুব তৎপরতার সঙ্গে মেশিন চালাচ্ছিল। একজন ছেলে দরজার সামনে থেকে একটু সরে বসে লেপ সেলাই করছিল। দু'জন নতুন কাপড় কাটছিল, আর মেশিনে সেলাই করার আগে সুতো দিয়ে টেঁকে নিচ্ছিল। লোকজন খুব মন দিয়ে রঙের বাহার দেখছিল, লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প গুজব করছিল, হুঁকো টানছিল, আর থুতু ফেলছিল। বিল্লেসুর নিজের মধ্যে বিভোর হয়ে হাঁটতে হাঁটতে শাশুড়ির বাড়ির দিকে চলল। একটা সরু গলির মধ্যে শাশুড়ির বাড়ি, বাড়িটা ভেঙে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। দরজা হাট করে খোলা। ডাক দিয়ে সে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। শাশুড়ি ওরই অপেক্ষায় ছিল। ওকে দেখে হেসে উঠে বসল। চোখ হাঁড়ির ওপর পড়ল। বিল্লেসুর গর্বভরে হাঁড়ি রাখল, শাশুড়িকে প্রণাম করল। শাশুড়ি এমনভাবে তার কুশল জিজ্ঞেস করল, যেন কত কাল পরে তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তারপর যে-খাটিয়া পাতা ছিল তার ওপর বসতে বলল। বিয়ের জন্যে উত্তেজিত বিল্লেসুরের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বিল্লেসুর খানিকক্ষণ গুরুগম্ভীরভাবে বসে রইল, ভারিক্কি গলায় সাদাসিধে গৃহস্থের মতো জিজ্ঞেস করল, 'ঠিকুজী বিচার করে দেখেছ তো?'

শাশুড়ির মনের সমুদ্রের ওপর দিয়ে তুফান বয়ে গেল।—পণ্ডিতের কাছে

গিয়েছিলাম—পণ্ডিত বিচার করেছে—চোখ তুলে বলল, 'সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যে-ঘরে যাবে সে-ঘর ফুলমন্ত হয়ে উঠবে'—রাজ যোটক, মেয়ে বৈশ্য বর্ণ, দেবগণ তোমার সঙ্গে কোনো বৈরী নেই। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছে, কুলে উঁচু, তাই যেন না বলে সে ছংগে, দুর্গাদাসের কুলের যেন অবশ্যই বলো। তা না হলে ওদের মর্যাদায় লাগবে।

বিল্লেসুর মনে মনে খুশী হল। বিনম্রভাবে বলল, 'পিতা-মাতার কথা সবাই মান্য করে। যেমন আজ্ঞা হবে, সেভাবে বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

শাশুড়ি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বিল্লেসুরের কাছে একজন পণ্ডিত ডেকে আনল। পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ এই বিয়ের যোটককে প্রশংসা করল। পরের লগ্নেই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। আর শাশুড়ির আজ্ঞানুসারে তার বাড়িতেই বিয়ে হবে বলে ঠিক হল। প্রদীপের আলোয় বিল্লেসুর কনেকে দেখল। বিশ্বাস হল, মেয়েটির কোনো কলঙ্ক নেই। বিল্লেসুর মেয়েটির হাত-পা দেখল, মুখ দেখতে পেল না। মেয়েটির মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল। তাকে আশ্বাস দিয়ে সে গ্রামের দিকে রওনা হল। টাকা মন্নীর শাশুড়ির কাছে দিয়ে এল।

সতেরো

যেন কেল্লা ফতে করে বিল্লেসুর গ্রামে ফিরে এল। ঘাড় টান টান করে সে ঘুরতে লাগল। প্রথমে লোকে ভাবল, মিষ্টিআলুর ভালো ফলন হয়েছে বলে এমন দেমাক দেখাচ্ছে। পরে সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে খোলসা হয়ে গেল। ত্রিলোচন তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারল, যে মেয়ের সঙ্গে সে বিল্লেসুরের বিয়ে দিতে চেয়েছিল, এ সে-ই মেয়ে। গ্রামের যারা বয়স্ক অবিবাহিত এবং যারা বিল্লেসুরের চাইতে বয়সে বড়, তারা এই বিয়ের খবর পেয়ে শিঁটকে গেল। ত্রিলোচন বিল্লেসুরের বিরুদ্ধে গা-জ্বালা-ধরা কথা বলে আবহাওয়া গরম করে তুলল, বলল, 'ব্রাহ্মণ না ছাই। যার বাপের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কোনো ভালো মানুষকে জল দেয়ার যোগ্য নয়।' লোকে ওর কথা বিশ্বাস করছিল।

গ্রামের বাজনাদার, ডোম এবং প্রজারা বারবার বিল্লেসুরের কাছে আসতে লাগল, খোশামোদ করে নানা কথা বলল, ঘরের আদল পালটে গিয়েছে, প্রদীপ জ্বল জ্বল করছে, বছরখানেকের মধ্যে বাপ-ঠাকুর্দার নাম উজ্জ্বল হবে! আগে তো শূন্য দরজা দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে চলে যেতে, এখন আর নড়ছি না, কিছু না নিয়ে যাব না। বিল্লেসুরের মনে খুশীর ঢেউ উঠছিল, আর সেই ঢেউ তার সারা চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভাবছিল—এমনিতেই নিজের আর্থিক অবস্থা ভালো না, এরপর ওরাও ঝামেলা বাড়ালো। থাকগে, যা থাকে কপালে, সে ঠিক করল বিয়ে

করবেই। লোকে তো নিন্দে করবেই, ভেবে তার ভয় হল—প্রজারা এ সুযোগ কেন হাতছাড়া করবে? চিন্তা করল, এদের কিছু না দিলে, পথ-চলা দুষ্কর। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে এদের সঙ্গে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্কে তা হলে ছেদ পড়বে। ভরসা হল, বিয়ের খরচ উতরে নিতে পারবে।

নাপিত তেল মালিশ করা এবং চুল ছাঁটার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। একদিন কাহার নিজের থেকে এসে দু-ঘড়া জল তুলে দিয়ে গেল। ধুনকর প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে চার মুঠো তুলো দিল। চামার এসে জিজ্ঞেস করল, বিয়ের জুতো পাকা চামড়া দিয়ে করব, না কাঁচা চামড়া দিয়ে করব। চৌকিদার প্রতিদিন রাতে হাঁক দিয়ে জানান দিতে লাগল, সে পাহারা দিচ্ছে। গঙ্গাবাসী একদিন দু'জোড়া পৈতা দিয়ে গেল। একদিন ভাট এসে সীতাস্বয়ম্বর এবং ভূষণের পদ আবৃত্তি করে গেল। অর্থাৎ সবাই এল।

বিল্লেসুর কিস্তিমাৎ করল, স্বয়ং জমিদার তার বাড়িতে এলেন। সারা গ্রাম ভেঙে পড়ল। বিল্লেসুরের বিয়ে হচ্ছে, তাই জমিদার এসেছেন। বিল্লেসুর অন্তত দু'টাকা নজরানা দেবে, জমিদার তাকে মদত করতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করবেন। ভাবল, কিছুটা এভাবে উশুল হবে, আর বাকিটা কানপুর থেকে আটা-চিনি আনতে গেলে গরুর গাড়ির ভাড়া ছাড়াও, মালপত্র কিছুটা কম এনে পুষিয়ে নেবে। ত্রিলোচন জমিদারের সঙ্গে ছিল। ভেবেছিল, জমিদারের পেছনে পুরো শক্তি নিয়োজিত করবে, তাতে ওর হাতে কিছু মালকড়ি আসবে। ত্রিলোচনকে দেখে বিল্লেসুর চোখ ঘুরিয়ে নিল। যখন ত্রিলোচন এবং অন্যান্যরা জমিদারের মদত নেয়ার জন্যে বিল্লেসুরকে বোঝাল,—'রিক্তপার্নিন পশ্যতে রাজনং দেবতাং গুরূম,'... কিন্তু বিল্লেসুর তার জায়গা থেকে এক চুলও নড়ল না। জমিদারের সম্মানার্থে সে দাঁতে দাঁত চেপে বসল, কিছুক্ষণ পরে জমিদার যখন দেখলেন মনের মতো কিছু হল না, তখন তিনি চলে গেলেন। ত্রিলোচন জমিদারের পেছন পেছন গেল। এগিয়ে গিয়ে বিল্লেসুরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে জমিদারের কান ভারি করল। বলল, 'শুধু আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি।' পরের দিন থেকে সারা গ্রামে বিল্লেসুরের ইজ্জত চারগুণ বেড়ে গেল। বিল্লেসুরের বাড়িতে জমিদারের আসার কারণ হিসেবে লোকে বলল, 'বিল্লেসুরের কাছে কারুর খাজানা আছে।' নানা ধরনের কথা রটতে লাগল। কেউ বলল, 'সোনার ইঁট নিয়ে এসেছে, কাউকে বলছে না, খুব ঘোড়েল। দেখবে, বছর দুয়েকের মধ্যে সারা গ্রাম কিনে নেবে।' আর একজন বলল, 'মহারাজের ওখান থেকে হীরে-জহরত চুরি করে এনেছে, কিন্তু ঘরে রাখেনি, বাড়ির বাইরে কোনো আবর্জনার নিচে বা গাছের তলায় পুঁতে রেখেছে, যাতে চোর চুরি করতে না পারে।' এ ধরনের কথা যত রটতে লাগল, বিল্লেসুরের সামনে লোক ততই নত হতে লাগল। অন্য গাঁয়ের মানুষ তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তার খবরা-খবর নিতে লাগল।

একদিন নাপিতকে ডেকে বিল্লেসুর বলল, 'মন্নীর শ্বশুরবাড়ি গোবর্দ্ধনপুরে যাও, বলে এস, বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে যাব। মেয়েকে যেন মন্নীর শাশুড়ি নিজের কাছে নিয়ে আসে। ওর বাড়িতেই বিয়ের মণ্ডপ হবে, আর বাদবাকি যেন এখানে এসে জেনে যায়।'

নাপিত বলে এল। তারপর আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করতে বেরুল—সঙ্গে নিল এক-একটা হলুদ আর এক-একটা সুপুরি। আর গায়ে-হলুদের কথা মুখে বলল। যারা পূজনীয়, তারা দু'জায়গা থেকে প্রণামী পাবে বলে ঘুরঘুর করতে লাগল।

বিল্লেসুরের বড়লোকির পাখনা গজিয়েছিল। সে এ-সুযোগ পুরো মাত্রায় গ্রহণ করল। অন্য গ্রাম থেকে গাড়ি চাইল। সম্পর্ক রাখার জন্যে মালিক গাড়ি দিল। বিল্লেসুর আটার কল থেকে গম ভাঙিয়ে আনল। গ্রামের বেকার বিধবাদের দিয়ে ডাল ভাঙিয়ে নিল। মালখান তেলিকে কানপুর থেকে চিনি আনতে বলল! বাকি অন্যান্য জিনিস এবং কাপড় তাঁতি, কাছী (সবজিওয়ালা), তেলি, তাম্বলী, ডোম এবং চামারদের কাছ থেকে তৈরি করিয়ে নিল। বাড়ির জন্যে দুশ্চিন্তা ছিল, আত্মীয়স্বজন এলে বকরিগুলোর সঙ্গে কীভাবে থাকবে! সে-চিন্তা দূর হয়ে গেল। সামনের চৌধুরী বাড়ির বিধবা মহিলা নিজের জন্যে শুধু একটা ঘর রেখে বাদবাকি ঘর বিয়ের জন্যে দিল। বিল্লেসুরের ভাগ্য খুলল, এতে তারও লাভ হল।

আত্মীয়রা আসতে লাগল—কুলের যারা এল তারা তার বাবার চেয়ে বয়সে বড়, তাদের সবাইকে প্রণামী দিতে হবে। চৌধুরী বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হওয়ার জন্যে সে সতর্ক হল। বকরিগুলোর কথা চিন্তা করে সে হাত গুটিয়ে নিল, আর আত্মীয়রা অন্যের বাড়িতে থাকার জন্যে, বাইরেই দিয়ে-থুয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে ভেবে, সে মনে করল বাজি মাৎ করেছে।

নিজের জন্যে বিয়েতে যে সব গয়নাগাঁটি লাগবে—কণ্ঠা, মোহনমালা, বাজু, কঙ্কণ, আংটি ইত্যাদি বিল্লেসুর অন্যের কাছ থেকে ধারে চেয়ে নিয়ে এল। মুরলী মহাজন এ-সব দিতে কোনো আপত্তি করল না। সেও বিল্লেসুরের মাহাত্ম্যর কথা শুনেছিল। কনের জন্যে যে-সব গয়না প্রয়োজন, তা সে চোরদের কাছ থেকে টাকায় দু'আনা কমিয়ে নগদ দামে কিনল। তারপর সেকরার কাছ থেকে তা গড়িয়ে নিল। পায়ের গয়না কিছুই করল না।

গায়ে-হলুদের দিন ডোমরা প্রচণ্ড জোরে বাজনা বাজাল। বিল্লেসুরের অদৃশ্য বৈভবের প্রভাব সবার ওপর পড়েছিল। পাশের গ্রামের জমিদার ঠাকুর সাহেব তহসিল থেকে ফেরার পথে বিল্লেসুরের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলেন। বিল্লেসুরকে দেখে নমস্কার করলেন। বিল্লেসুরের বিপুল ঐশ্বর্যের কথা ভেবে বললেন, লোকের চোখ দেখে আমি সব ঠাহর করতে পারি, বিয়ে করতে যাচ্ছ, ইচ্ছে করলে আমার ঘোড়া নিতে পার! বিল্লেসুর নিজের রহস্য গোপন করে বলল, 'আমি গরীব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মতো যাব। আপনি আমাদের রাজা, সব কিছুই আপনি দিতে পারেন।

' রহস্য খুলছে না দেখে ঠাকুর সাহেব মুচকি হাসলেন। তারপর নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

মাতৃ-পুজোর পরের দিন বরযাত্রী রওনা হল। কুয়ো পুজো করল। বিল্লেসুরের একজন কাকী বিল্লেসুরকে দুধ খাওয়ালো। দুধ খাওয়ানোর পর কাকী অনেকক্ষণ কুয়োর পাটের ওপর পা ঝুলিয়ে জিদ ধরে বসে রইল। জিজ্ঞেস করার পর বলল, 'আমি সোনার ইঁট নেব।' গ্রামের লোক বলল, 'মিথ্যে তো বলেনি, এখন দেবে না তো কখন দেবে!' বিল্লেসুর বলল, 'কাকী, এখানে তো খালি হাতে আছি, পা এগিয়ে দাও, ফিরে এসে তোমাকে ইঁটই দেব।' কাকী খুশী হল। সবাই বিশ্বাস করল, বিল্লেসুরের কাছে পঞ্চাশটারও বেশি সোনার ইঁট আছে।

বরযাত্রী রওনা হল। অভ্যর্থনা, দুয়োর পুজো, বিয়ে, জল খাবার, ভোজ, দেয়া-নেয়া, চতুর্থী—সব রকম অনুষ্ঠানই হল। জনা পাঁচেক গণ্যমান্য, পূজনীয়রা গিয়েছিলেন, আর বাদ বাকি সবাই ছিল কাহার, বাজনাদার, পাড়া-প্রতিবেশীরা। চারদিন পরে বৌ নিয়ে বিল্লেসুর বাড়ি ফিরল। তার ধনী হওয়ার গোপন রহস্য বেঁচে থাকা পর্যন্ত সে কাউকে জানাল না।

Lasertypeset at Impression Printers & Publishers, Calcutta
and printed at Tarang Printers, Delhi-110092